স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ

হেলেনা খান

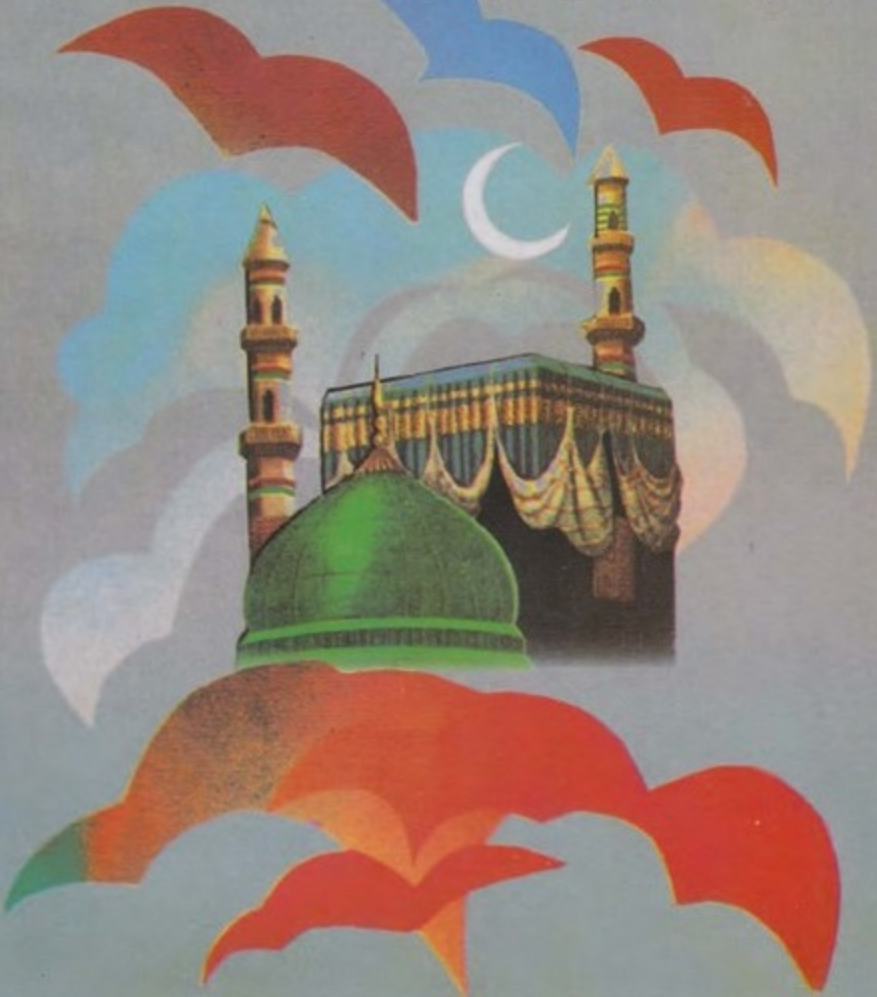

স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ

(শিশু-কিশোরদের ভ্রমণ কাহিনী)

রফিকের ভ্রমণকাল : ১৯৮২ খ্রী :

হেলেনা খান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.amarboi.org

স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ

হেলেনা খান

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন

পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

স্বত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ ঃ মাঘ ১৪০৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯

দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন ২০১২

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদ

সিরাজুল ইসলাম বিশ্বাস

মূল্য ঃ ৬০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

SHAPNAR DESH NABIR DESH by Halana Khan; Published by: S.M. Raisuddin, Director Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price: Tk. 60/- US: 3/- Price: **ISBN. 984-493-039-1**

www.amarboi.org

উৎসর্গ

আমার আম্মা
মরহুমা মোসাম্মৎ
খাতেমন্নেসার স্মরণে

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

"স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ" গ্রন্থটি মূলতঃ একটি ভ্রমণ কাহিনী। লেখিকার পবিত্র হজ্বব্রত পালন উপলক্ষে মক্কা-মদীনা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে এই গ্রন্থটি প্রণীত হয়।

হেলেনা খানের 'স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ' গ্রন্থটি পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী তৃতীয় সংস্করনের উদ্যোগ নিয়েছে এ দেশের ঐতিহ্যবাহী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ। শিশু-কিশোরেরা এই গ্রন্থটির মাধ্যমে মুসলমানদের পবিত্র ভূমি মক্কা-মদীনা এবং ঐতিহাসিক পবিত্র স্থানগুলো সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। মিসেস হেলেনা খানের পরিশ্রমলব্ধ 'স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ' গ্রন্থটি শিশু-কিশোরদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য, গর্বিত ও আনন্দিত। এ জন্যে আমরা পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। বর্তমানে প্রকাশনা জগতে এ ধরনের বইয়ের তীব্র অভাব রয়েছে। কচি ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী শিশু-কিশোরেরা এই বইটি সাদরে গ্রহণ করলে অথবা তাদের কাছে সমাদৃত হলে আমাদের পরিশ্রম ও আয়োজন সার্থক হবে।

বইটির পাঠক চাহিদা থাকায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। আশা করি শিশু-কিশোদের নিকট বইটি বেশী করে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ হাফিজ।

এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

মুখবন্ধ

১৯৭৭ সালে মহান আল্লাহ্‌তায়ালার পরম অনুগ্রহে আমি পবিত্র হজ্বব্রত সম্পাদন করি। হজ্ব করে ফিরে আসার পর বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকার তৎকালীন মহাপরিচালক জনাব শাহেদ আলী সাহেবের তরফ থেকে হজ্ব ও মক্কা-মদীনা ভিত্তিক একটি গ্রন্থ রচনা করার তাগিদ আসে। এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনা করার ইচ্ছে আমারও ছিল। তাই মক্কা, মদীনা ও জেদ্দার পটভূমিতে হজ্ব, তাওয়াফ ও অন্যান্য বিবরণসহ নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপকরণ নিয়ে আমি এ গ্রন্থটি রচনা করার প্রয়াস পেয়েছি।

মক্কা, মদীনায় অবস্থানরত আমার ছোট বোন রোকেয়ার বালক-পুত্র মালিক মুরাদ হোসেন, দীপের দৃষ্টিভঙ্গিতে, উপন্যাসের আমেজে আমি রচনা করেছি 'স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ' ভ্রমণ কাহিনী। আর দীপের জীবনের আবছা ছায়া অবলম্বনে চিত্রিত করেছি রফিকের চরিত্রটি।

আমি জনাব শাহেদ আলী সাহেবকে অনেক দেরিতে হলেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কেননা তারই অনুপ্রেরণায় আমি রাসূলে করিমের (সঃ) পুণ্যভূমির বিবরণ লিখতে লেখনী ধারণ করেছিলাম। বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হবার জন্য মনোনীত হয়েছিল। কিন্তু কালক্ষেপণ না করে আমার অনুরোধে প্রখ্যাত কবি ও গবেষক জনাব আবদুস্ সাত্তার বইটি ঢাকার আহমদ পাবলিশিং হাউসের মাধ্যমে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে জন্য আমি তাঁর কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

প্রথম প্রকাশের পর সব ক'টি গ্রন্থ অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রি হয়ে যায়। অনেক হজ্বযাত্রী এ বইটি তাঁদের সাথে নিয়ে গিয়ে উপকৃত হয়েছেন বলে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। বহু পাঠকের কাছ থেকেও এ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার তাগিদ আসে। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে দেরিই হয়ে যায়।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা পাঠকদের সে চাহিদা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছেন, সে জন্য সোসাইটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

প্রথম প্রকাশিত বইটির নাম ছিল 'ফুল-পাখি-সৌরভ'। এর মর্মার্থ অনেক শিশু-কিশোরের কাছে সহজবোধ্য না হওয়ায়, দ্বিতীয় প্রকাশে বইটির পরিবর্তিত নামকরণ করা হয়েছে 'স্বপ্নের দেশ নবীর দেশ'।

হেলেনা খান

www.amarboi.org

সূচীপত্র

বিবি হাওয়া (আঃ) এর কবর যেখানে	ঃ	৭
মক্কা শরীফে	ঃ	১১
সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়	ঃ	১৫
কালো পাথর	ঃ	১৬
হৃদয় দিয়ে অনুভব	ঃ	১৮
সম্পদ	ঃ	২০
খোলা জানালা	ঃ	২১
মক্কার আশেপাশে	ঃ	২৪
জাবালে সূরে ও জাবালে নূরে	ঃ	২৬
হেরা গুহায়	ঃ	২৮
মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় কিছুক্ষণ	ঃ	২৯
ভিখারির খোঁজে	ঃ	৩৩
নীল আকাশের বুকে	ঃ	৩৫
লেখাপড়ার মাঝে	ঃ	৩৯
দাওয়াতে	ঃ	৪১
মদীনার পথে	ঃ	৪৪
বদর প্রান্তরে	ঃ	৪৬
মদীনা মনোওয়ারায়- মস্‌জিদে নববীতে	ঃ	৪৮
পুরনো মদীনায়	ঃ	৫০
জান্নাতুল বাকি	ঃ	৫৩
আলোরেখা	ঃ	৫৪

www.amarboi.org

বিবি হাওয়া (আঃ)-এর কবর যেখানে

রফিক তার আব্বা আম্মার সাথে প্লেন থেকে নামল। জেদ্দা ইন্টারন্যাশনাল এয়ার পোর্ট। নতুন তৈরি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বিমান বন্দর। অপরূপ!

"এই বিমান বন্দরের নকশাটি করেছিলেন বাংলাদেশের খুব বিখ্যাত একজন ইঞ্জিনীয়ার। নাম ফজলুর রহমান খান।" আব্বার কাছ থেকে এ কথাটা জেনে রফিক খুবই গর্ব অনুভব করে যে, তাদের দেশেরই একজন এই চমৎকার নক্‌শাটা তৈরি করেছেন।

এয়ারপোর্ট নয়, ঝলমলে বিরাট একটা শহর যেন।

জেদ্দায় এসে ভীষণ অবাক হয়েছে রফিক। কোথায়? আরব দেশের কথা তো শুনেছে– ধূ ধূ করা বিস্তীর্ণ বালুকা ভরা মরুভূমি! মরুভূমির মাঝে শুধু মরুদ্যান অর্থাৎ খেজুর বাগান, আর গাছপালাবিহীন কেবল শক্ত পাথরের পাহাড়।

এখানে আসবার আগে ছোট চাচা মানচিত্রটা খুলে আরবের অবস্থানটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

"এই যে দেখছিস এশিয়া, এর পশ্চিম প্রান্তে আরব দেশ। উত্তরে দেখ্ সিরিয়া ও ইরাক। দক্ষিণে আরব সাগর। পূর্বে ওমান ও পারস্য উপসাগর ও পশ্চিমে লোহিত সাগর। এই লোহিত সাগরের পারেই জেদ্দা সমুদ্র বন্দর ও বিরাট বিমান বন্দর।"

ছোটচাচা এ দেশের আয়তন ও লোক সংখ্যার কথাও বলেছিলেন। আয়তন ৯,২৭০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯৮১ সনের হিসেবে ১০,৪০০,০০০ জন। অধিবাসীরা প্রায় সবাই মুসলমান।

ছোটচাচা সউদি আরবে যাননি। বইপত্র পড়ে ও জেনে-শুনে সব খবরাখবর দিচ্ছিলেন। বলেছিলেন, "শুনেছি আজকাল ওখানে খুব দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। জেদ্দাকে খুব সুন্দর ও আধুনিক শহর করা হয়েছে।"

রফিক দেখল, সত্যি তাই।

.... কাষ্টম্‌সের ব্যাপারটা চুকে গেলে রফিকরা বাইরে এল। রফিকের আব্বা হাসান আহমেদ মক্কায় যে অফিসে 'জয়েন' করতে এসেছেন, সেই অফিসেরই আহমদ সাফা নিজেই গাড়ি নিয়ে এসেছে।

আব্বার এক চাচাত ভাই ডাঃ আলীম আহমেদ মক্কার কিং আবদুল আজিজ হাসপাতালের একজন বড় ডাক্তার। তাদের এগিয়ে নেবার জন্য আসবার কথা ছিল। কিন্তু কী একটা জরুরি কাজে তিনি রাজধানী রিয়াদে গেছেন। বেশ কয়েক দিনের জন্য।

জেদ্দা থেকে মক্কা প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে। মক্কায় রওয়ানা দেবার আগে জেদ্দা শহরটা একটু ঘুরে যাবে তারা। আহমদ সাফা বয়সে তরুণ। অত্যন্ত বিনীয়। রং ফরসা, সুন্দর চেহারা, ঘন কালো চুল। পরনে সাদা লম্বা কামিয–তোফ।

তার আব্বা আম্মা প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে সউদি আরবে এসেছেন। এখানেই

www.amarboi.org

বাড়ি ঘর কিনে নিয়েছেন। সাফার জন্ম সউদি আরবে। তবে আব্বা আম্মা তাকে বাংলাভাষাতে কথা বলতে শিখিয়েছেন। মাঝে মাঝে অবশ্য কিছুটা ঠেকে যায়। সাফা বলে, "আপনারা কেলান্ত আছেন। চলুন, একটা রেষ্টুরেন্টে আগে শাহী খেয়ে নেবেন।"

"শাহী কী?"

রফিকের প্রশ্নে শুধরে নেয় সাফা– "মানে চা।"

একটা মাঝারি ধরনের রেষ্টুরেন্টে এসে ওরা বসল। দেখা গেল নানান দেশের লোক। এক একটা গোল টেবিল ঘিরে তারা বসেছে। একদিকে বসেছে বোকরা পরা দু'জন মহিলা ও তাদের সাথে তোফ পরা পুরুষেরা। অপরদিকে কুচকুচে কালো স্ত্রী-পুরুষ। অন্যদিকে ফরসা, সুন্দর চেহারার মোটা সোটা মহিলা ও পুরুষেরা। রফিক পেছনে ঘুরে দেখে– অমা! ম্যাক্সি পরা কয়েকজন মেয়ে!

রফিকের ভারি মজা লাগে দেখতে– কত দেশের, কত রকম লোক। তাদের বিচিত্র পোশাক। ভাষাও বিচিত্র।

"এখানে বহুত কিসিমের লোক আপনারা দেখবেন।" বলল সাফা, "সরকারি মিনিস্ট্রির দফতর ও ব্যাংকের বড় অফিসগুলো এখানে রয়েছে কিনা!" একজন তোফ পরা লোক রফিকদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, "ইয়া রফিক!"

রফিক চমকে তাকাল। লোকটি আহমদ সাফার দিকে তাকিয়ে আরবিতে কী কী সব বলল। শেষের কথাগুলো রফিক মনে রেখেছে। "শাহী সুলেমানী? ইয়া শাহী হালিব?"

সাফা আরবীতে লোকটির সাথে কথা বলে এদের দিকে তাকালো। "শাহী হালিব অর্থাৎ দুধ চায়ের অর্ডারই কিন্তু দিলাম।"

"ওই ভদ্রলোক আমার নাম জানলেন কী করে?" রফিকের প্রশ্নে হাসল সাফা।

"আসলে কী জান ভাইয়া, এখানে লোকেরা যখন আজনবী মানে অপরিচিত, প্রায় সমান বয়সী কাউকে ডাকে, বলে ইয়া আখি মানে ওহে ভাই। বড়দের বলে ইয়া শেখ, মানে এই যে সাহেব। বেশির ভাগ সময়ে সমবয়সী কিংবা কিছু বড় বা ছোটদের বলে ইয়া রফিক, মানে ওগো বন্ধু।"

"অ, তাই বলুন। আমি তো আমার নাম ধরে ডাকতে শুনে অবাক হ'য়ে গিয়েছিলাম।"

সাফা রফিকের আব্বা আম্মার সাথে কী খাবার অর্ডার দেবে বুঝে নিয়ে খুব্‌য্ অর্থাৎ লম্বা আকারের পাউরুটি ও দুটো মুরগির রোস্ট আনতে বলল।

রফিক লক্ষ্য করলো দরজার কাছে ছোট একটা টেবিলে সাদা লম্বা কামিয পরা দু'জন অল্প বয়সী লোক বসেছে। তাদের গায়ের রং শ্যামলা।

তবে কথা বলছে চোস্ত আরবি ভাষায়।

"এরা কিছুটা গরিব আছে।" গলার স্বর একদম খাদে নামিয়ে বলল সাফা। বেয়ারা তাদের টেবিলে দুটো গরম রোষ্ট দিয়ে গেল। খুব্‌য্ ও মুহাল্লিবি অর্থাৎ ফিরনি আগেই দিয়ে গেছে। আম্মা ছুরি দিয়ে কেটে রোষ্ট দুটো ভাগ করলেন। খাওয়া শেষে বিলের কথা শুনে আহমদ সাফা ছাড়া আর

www.amarboi.org

সবারই চক্ষু তো কপালে উঠে গেল। একটা রোষ্টের দাম আট রিয়াল। অর্থাৎ বর্তমানে সরকারি রেটে এক রিয়াল আমাদের দেশী ছ'টাকা হ'লে দাম পড়ল গিয়ে আট চল্লিশ টাকা! আরে সর্বনাশ! তবে এখানে লোকেরা তো এক রিয়াল ছ'টাকা হিসেবে ধরে না। তারা এক রিয়ালকে এক টাকার মতোই মনে করে। ওই দুটি বন্ধু, যাদের সাফা 'গরিব আছে' বলেছিল, বিল শোধ করে উঠে যাচ্ছে। রফিক অবাক হ'য়ে দেখল, এত দামী রোষ্ট দুটো ওরা অর্ধেক করেও খায়নি। কি জানি বাবা! এরা আবার কী রকম গরিব?

এবার শহর দেখা। সুন্দর চওড়া পাকা রাস্তা। রাস্তার ধারে ধারে ইলেকট্রিক আলোর খুঁটি। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। খুব আরাম। ঝাঁকুনি নেই একটুও। দু'পাশে আধুনিক ডিজাইনের কত্তো যে বড় বড় বাড়ি! কয়েক তলা বিশিষ্ট। আর কী চমৎকার যে দেখতে! অনেকগুলো বাড়ি গাছপালায় সাজানো। রাস্তার দু'পাশেও গাছের সারি। রাস্তার আইল্যান্ডগুলোর মাঝেও রং-বেরঙের ফুল গাছ।

"তবে না মেজো ফুপা বলেছিলেন, আরবে গাছপালা নেই। কেবল পাথর আর পাথর!"

"তোমার ফুপা ভুল বলেননি ভাইয়া। এদেশে গাছ বাঁচিয়ে রাখতে হ'লে বহুত কষ্ট করতে হয়। বিদেশ থেকে মাটি পর্যন্ত আনতে হয়। অনেক রিয়াল লাগে।"

অল্পক্ষণের মধ্যে সাফা লোহিত সাগরের খুব সাজানো এক প্রান্তে এনে গাড়ি থামায়। রফিক জানে লোহিত মানে লাল, কিন্তু দেখল লোহিত সাগরের পানি সাদাটে আর লোনা। সাফা জানাল যে, জেদ্দায় সাধারণ পানি আসে অনেক দূর থেকে, পাইপের ভেতর দিয়ে। সউদি আরবে বিদেশ থেকে পানি আমদানি করতে হয়। কেননা বাংলাদেশের মতো এখানে খাল, বিল, নদী-নালা, পুকুর কিছুই নেই। শুধু জমজম কূয়োর পানি দিয়ে এদের পানির প্রয়োজন মেটে না। লোহিত সাগরের পানিও আজকাল পরিবর্তিত পরিশোধিত করে প্রায় সবরকম কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর ডিপ টিউবওয়েলও বসানো হয়েছে অনেক। গাড়ি থেকে নেমে রফিকের হাত ধরল সাফা। "বুঝলে ভাইয়া, সউদি আরবের লোকেরা কিন্তু পানির অপচয় একদম সহ্য করতে পারে না।"

সমুদ্র তীরে অনেকটা জায়গা জুড়ে শক্ত ও সুন্দর রেলিঙের ঘের। কাছেই গাড়ি পার্ক করার জায়গা ও ভ্রাম্যমাণ দোকান রয়েছে।

ওরা তীর থেকে নেমে কিছুটা বালুতে হাঁটাহাঁটি করল। রফিক একমুঠো বালু তুলে নিল। আম্মাকে দেখিয়ে বলল, "দেখ আম্মু, এ বালু আমাদের দেশের মতো মিহি না। মোটা, আর কাঁকর মেশানো!"

সমুদ্র তীর থেকে তারা এবার একটি বাজারে এল। দোকানগুলো কয়েকতলা বিশিষ্ট। সাফা বলল, "পৃথিবীর বিখ্যাত বাজারগুলোর মধ্যে এটি একটি। বাসনপত্র, কাপড়-চোপড় বা অন্যান্য জিনিস যা লাগবে, এখান থেকে কিনে নেওয়া ভাল।"

কেনাকাটার পর আব্বা বললেন, "আদি মা, বিবি হাওয়া (আঃ)-এর কবরটা যিয়ারত করতে চাই।" রফিকের আম্মা বেগম লায়লারও আন্তরিক ইচ্ছে কবরটা একবার দেখে যাবেন।

রফিক আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)-এর কাহিনী জানে।

প্রথমে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁর প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য মাটি দিয়ে আদমকে তৈরি করেছিলেন।

www.amarboi.org

তারপর সব ফেরেশতা ও জিনদের হুকুম করলেন ঃ "আমার তৈরি আদমকে সেজদা কর।" সবাই আদমকে সেজদা করলেন, কিন্তু একজন জিন তা মানল না। সে বলল, "আমাকে আপনি তৈরি করেছেন আগুন দিয়ে, আর ওকে সাধারণ মাটি দিয়ে।"

আল্লাহ্তায়ালার আদেশ অমান্য করার জন্য তার নাম হল ইবলিস। শাস্তি হ'ল। তাকে ঐ স্থান থেকে বের করে দেওয়া হ'ল।

ইবলিস তখন আল্লাহ্তায়ালার কাছে একটি আরজি করল। "হে আল্লাহ্! আমি বহুদিন আপনার ইবাদত করেছি। আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত একটা স্বাধীনতা দিন। আপনার তৈরি মানুষদের যা'তে দলে টানতে পারি, সে চেষ্টা করবার স্বাধীনতা।"

আল্লাহ্ অনুমতি দিলেন।

ইবলিস প্রথমেই লাগলো আদম (আঃ)-এর পেছনে।

আল্লাহ্তায়ালা আদমের একজন সঙ্গী বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করে তাঁদের বেহেশতে সুখ-শান্তিতে থাকতে দিলেন। ফুলে ফলে ভরা বাগান। খুব সুন্দর। সেখানে এনে তাঁদের একটা গাছ দেখিয়ে বলা হ'ল, "বাগানের সব গাছের ফল ইচ্ছেমতো পেড়ে খেতে পার, কিন্তু সাবধান! এই গন্ধম গাছটার ফলে যেন ভুলেও হাত দিও না! তোমাদের জন্য এ গাছের ফল খাওয়া নিষেধ।"

শয়তান ভাবল এই সুযোগ! সে করল কী, নানান রকম ছল-ছুতো করে আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ)কে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওই গাছের ফল খাওয়ালো। সেই মুহূর্তে তাঁরা আল্লাহ্র নিষেধ ভুলে গিয়েছিলেন। আদেশ অমান্য করার ফলে শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ্ তাঁদের ঐ সুন্দর স্থান থেকে সরিয়ে দিলেন পৃথিবীতে। দু'জনকে দু'জায়গায়। অনেক অনেক বছর ধরে তারা কষ্ট করলেন। তারপর, কথিত আছে আরাফাতের ময়দানে যেখানে জ্বিলহজ্ব মাসের ৯ই তারিখে অবস্থান করে হজ্বের প্রধানতম ফরয আদায় করা হয়, সেখানে তাঁদের পুনরায় মিলন হয়।

সাফা বলল, "এই জেদ্দাতেই নাকি বিবি হাওয়া (আঃ)-এর মৃত্যু হ'য়েছিল। কথিত আছে এখানকার সাধারণ গোরস্থানেই তাঁর কবর রয়েছে এবং অনুমান থেকে এ স্থানের নাম হ'ল জেদ্দা। কেননা আরবিতে দাদি-নানিকে বলা হয় জাদ্দাতুন।"

আহমদ সাফার সব রাস্তাই ভালভাবে চেনা। মা হাওয়ার নামে যে সড়ক রয়েছে, সেখানে এনে সে গাড়ি থামালো। রাস্তার পাশেই গোরস্থান। অতি সাধারণ। একটা পাতাবাহারের গাছ পর্যন্ত লাগানো নেই।

সউদি আরবে মেয়েদের কবরস্থানে যাওয়া মানা বলে আম্মা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে দু'আ-দরূদ পড়তে থাকেন।

কোন কবরই বাঁধানো নয়।

সাফা রফিক ও আব্বাকে নিয়ে ভেতরে কবর জিয়ারত করতে গেল। গোরস্থানের রক্ষক একটা স্থান দেখিয়ে বলল, "আন্দাজ করা হয় এখানেই মা হাওয়াকে কবর দেওয়া হয়েছিল।" জায়গাটার নিশানা সে ঠিকমতো দিতে পারল না। সে কেন, কেউই জানে না।

যাহোক্, ধরে নেয়া হয়েছে এখানেই মা হাওয়ার সমাধি। তিনিই পৃথিবীর প্রথম মহিলা, প্রথম মা

www.amarboi.org

ভাবতে রফিকের কী তাজ্জবই যে লাগছে!

সে তার আব্বা ও সাফা ভাইয়ার সাথে কবর জিয়ারত করল। ওরা কী দু'আ পড়লেন জানে না রফিক। তবে সে তার জানা সব ক'টা সূরা মনে মনে বলে গেল। তারপর আল্লাহ্‌র কাছে অনেকক্ষণ ধরে মা হাওয়ার জন্য দু'আ চাইল।

"হে আল্লাহ্! মা হাওয়া ও বাবা আদমের গোনাহ্ তুমি মাফ করে দাও। আর আমাকেও মাফ করে দিও। আমি আম্মার মানা না শুনে, লুকিয়ে স্কুলের গেটের আচারয়ালার কাছ থেকে আচার কিনে খেতাম। আমি আর কখনো আম্মাকে লুকিয়ে কিছু করব না। তাঁর কথার অবাধ্য হ'ব না।"

মক্কা শরীফে

জেদ্দা থেকে মক্কার পথে রওয়ানা দেবার আগে রফিক তার আব্বার মতো 'এহ্‌রাম' এর পোশাক পরে নিল অর্থাৎ সেলাই ছাড়া একটা সাদা কাপড় লুঙ্গির মতো ক'রে পরল। অন্য একটা কাটা সাদা কাপড় চাদরের মত গায়ে দিল। কাপড় পরবার আগে নখ কেটে, গোসল ক'রে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হ'য়ে নিল।

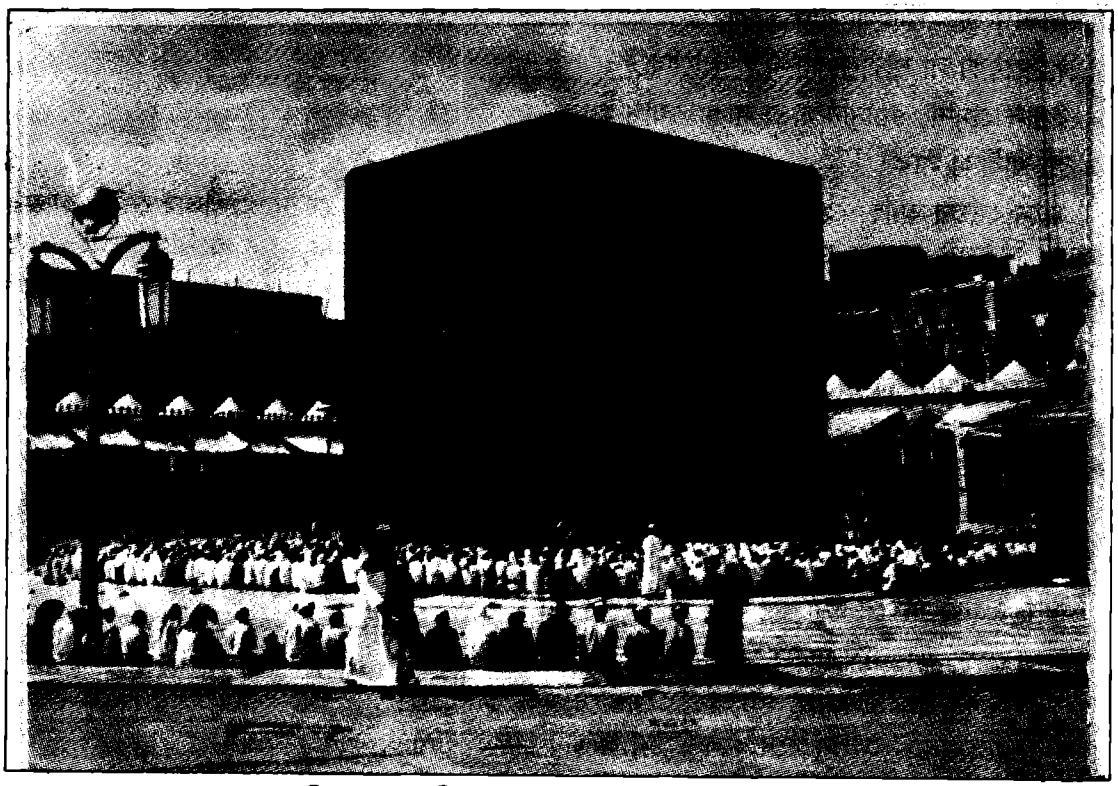

মক্কার পবিত্র কা'বা শরীফ ঃ পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনালয়

www.amarboi.org

আম্মা কিন্তু সেলাই করা ব্লাউজ-পেটিকোট পরলেন। মেয়েদের ওরকম পরা চলে। বোরকার নিচে মাথায় বড় একটা রুমাল এমনভাবে বেঁধে নিলেন যা'তে কপাল ও কানের কাছে একটা চুলও দেখা না যায়। শুধু হজ্বের জন্যই নয়, মক্কাশরীফে ঢুকলেই 'এহ্‌রাম' অর্থাৎ হজ্ব বা ওমরার জন্য দৃঢ় সংকল্প ক'রে ঢুকতে হয় এবং ভক্তিভরে কাবাঘর বা বায়তুল্লাহ্ যার মানে হ'ল আল্লাহ্‌র ঘর– সাতবার প্রদক্ষিণ করতে হয়। এই প্রদক্ষিণ করাকে 'তাওয়াফ' বলে।

আহমদ সাফা মক্কা থেকে বেরিয়ে এলেও, মক্কার বাসিন্দা বলে তার এহ্‌রাম বাঁধার দরকার হ'ল না।

পোশাক পরার পর ওজু করে রফিক ও তার আব্বা-আম্মা দু'রাকাত এহ্‌রামের নামায পড়লেন। নামাযের পর সালাম ফিরিয়ে ঐ জায়গাতেই ওরা এহ্‌রামের নিয়ত করে নিলেন।

"হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি কাবাঘর তাওয়াফের ইচ্ছে করি। অতঃপর তুমি আমার জন্য তা সহজ কর ও আমা হ'তে তা কবুল কর।"

তাঁরা সবাই এবার মক্কাশরীফের দিকে রওয়ানা দেবেন। সাফা ভাইয়ার সাথে ওরা তিনবার 'তালবিয়া' অর্থাৎ

লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক্,

লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক্,

ইন্নাল হাম্‌দা, ওয়ান্‌নি'মাতা লাকা ওয়াল্ মুল্‌ক্,

লা শারীকা লাক্!

মানে হাজির আছি, হে আল্লাহ্, হাজির আছি। হে আল্লাহ্, তোমার কোন অংশীদার নেই। হাজির আছি। নিশ্চয়ই তোমার জন্য সমস্ত প্রশংসা, নিয়ামত ও রাজত্ব। তোমার কোন অংশীদার নেই। এই কথাগুলো উচ্চারণ করল সাফা। রফিকও আব্বা সাফার সাথে সুর মিলিয়ে জোরে ও আম্মা উচ্চারণ করেন নিচু স্বরে।

রফিকের দিকে ফিরে বললেন আব্বা, "এহ্‌রাম বাঁধার পর মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র সামনে হাজির আছি, প্রতিজ্ঞা করেছি। মন থেকে সব খারাপ ভাবনা মুছে ফেলতে হবে। লোভ, হিংসা, রাগ সব ছাড়তে হবে। কোন রকম প্রাণী হত্যা চলবে না। সব ব্যাপারেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে।"

সবাই গাড়িতে উঠলে আহমদ সাফা রওয়ানা দিল। বলল, "ট্যাক্সি বা নিজেদের গাড়িতে জেদ্দা থেকে মক্কা পৌঁছতে সাধারণত পৌনে এক ঘন্টা বা এক ঘন্টার বেশি সময় লাগে না।"

সাফার দৃষ্টি সামনে। মুখে সুমধুর তালবিয়ার সুর।

মক্কা থেকে প্রায় দশ মাইল আগে পথে হুদায়বিয়া পড়ল।

"এই সেই ইতিহাসখ্যাত হুদায়বিয়া যেখানে নবী করিম (সঃ) বিধর্মী কুরাইশদের সাথে একটা সন্ধি করেছিলেন।" আপন মনে বলে উঠেন আম্মা। রফিক ঘটনাটা জানতে চায়।

"ঘটনাটা হ'ল একবার হযরত মুহম্মদ (সঃ) হজ্ব করার উদ্দেশ্যে পনরশ' সাহাবা নিয়ে মদীনা

www.amarboi.org

থেকে মক্কায় আসছিলেন। কুরাইশরা এ খবরটা পেয়ে ছুটে এল এই হুদায়বিয়ায়। তারা তাঁদের মক্কা শরীফে ঢুকতে দেবে না। বাধা পেয়ে নবী করিম (সঃ) কুরাইশদের সাথে এখানে এক সন্ধি করেন। ইতিহাসে তাহুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। এই সন্ধির কয়েকটা শর্ত ছিল। তার মধ্যে দু'টি শত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি হ'ল, নবীজি (সঃ) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এক বছর পর মক্কায় ঢুকতে পারবেন, তার আগে নয়। অন্যটি হ'ল, মুসলমান ও কুরাইশদের মধ্যে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।"

হুদায়বিয়া থেকে মক্কা শরীফের সীমানা আরম্ভ। সন্ধ্যার কিছু আগেই তাঁরা মক্কায় পৌঁছে গেলেন। পাথরের পাহাড়ের ওপর এই প্রাচীন শহর। পুরনোর পাশাপাশি নতুন সব ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট ও দোকান-পাট। ভারি সুন্দর! পথের দু'পাশে তখন বিজলি বাতির ঝলমলে হাসি। উঁচু-নিচু পথ বেয়ে সাফা ধীর গতিতে গাড়ি চালাতে থাকে। বলে, "এখানে দেখবেন ট্রাফিক পুলিশ কর্তব্য সম্বন্ধে কী ভীষণ সচেতন! ড্রাইভাররাও তেমনি। গাড়ি চালাবার সময় কেউ 'ওভারটেক্' করতে চেষ্টা করে না।"

সাফা তাদের নিয়ে প্রথমে এক সরকারি অফিসে এল। পাসপোর্ট ও হাসান সাহেবের চাকরিতে যোগদানপত্র ইত্যাদি দেখানোর পর তাদের গাড়ি মক্কার কয়েকটা পথ ঘুরে ঢুকল মিস্‌ফালাহ্ এলাকায়। সাফা মিস্‌ফালাহ্‌র পরিচিতি দেয়। এটি ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবুবকরের (রাঃ) জন্মস্থান। হজ্বের সময় এ এলাকার মোয়াল্লেমরা সাধারণত বাংলাদেশী হাজিদের থাকবার ব্যবস্থা এইখানেই করে থাকেন। মোয়াল্লেমরা আবার অধিকাংশই এককালে বাংলাদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনিরা অবশ্য এখন পুরোপুরি আরবিতে কথা বলে।

রফিকদের জন্য যে বাড়িটা ঠিক করা হয়েছে, সেটি পাহাড়ের ওপরে। বেশ উঁচুতে। নিচের সদর রাস্তা থেকে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ বেয়ে হেঁটে উঠতে হয়।

সাফা গাড়িটা সদর রাস্তার এক পাশে রেখে এসেছে।

"অত দূরে গাড়িটা রইল। পার্টস্ চুরি হয়ে যাবে না তো?"

"না চাচা, এখানে এসবের প্রশ্নই ওঠে না। সাধারণত কেউই চুরি করে না। এখানে চুরির শাস্তি জানেন তো? ভয়ংকর! ধরা পড়লে হাত কাটা যায়।"

ওপরে উঠতে উঠতে আব্বা সউদি আরবের আবহাওয়ার কথা জানতে চাইলেন।

সাফা বলল, "এখানে আপনারা প্রধানত দু'রকম ঋতু দেখবেন। খুব শীত আর খুব গরম। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকাল, আর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে দিনে প্রচন্ড গরম থাকলেও সন্ধ্যেটা বড়ই মধুর। এমনিতে সউদি আরবের আবহাওয়া শুকনো, কিন্তু সমুদ্র তীরের জায়গাগুলো ভেজা ভেজা। আর জানেন, শীতের আরম্ভের দিকে মাঝে মাঝেই হঠাৎ প্রচন্ড বালুর ঝড় ওঠে।"

আম্মা বাড়ির ঘর-দোর, বারান্দা ইত্যাদি সব দেখে নিলেন। সবক'টা কামরাই আসবাবপত্রে সাজানো। রান্নাঘরে বৈদ্যুতিক চুলো রয়েছে।

www.amarboi.org

সাফা কাছের একটা রেস্তোরাঁ থেকে 'ফতিরা' কিনে নিয়ে এল। সব্জি ও গোশত মেশানো এক রকম পরোটা। ইয়া বড় আর মোটা! ক্ষুধার মুখে গরম গরম ওই পরোটা খেতে বেশ ভাল লাগল। খেয়ে-দেয়ে ওজু করে সবাই কাবাঘর তাওয়াফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল মসজিদুল হারামের দিকে, সংক্ষেপে যাকে বলা হয় হেরেম শরীফ। ওদের বাসা থেকে খুব বেশি দূরে নয়।

চলতে চলতে আব্বা রফিকের দিকে ফিরলেন, "জেনে রেখো রফিক, 'মসজিদুল হারাম' কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মসজিদ।"

রফিকদের সবার মনে এইক্ষণে অদ্ভুত এক আনন্দ ও আলোড়ন! হেঁটে কিছুটা এগিয়ে যেতেই হেরেম শরীফের উঁচু মিনার ও প্রশস্ত দরজাগুলো নজরে পড়ে। সাফা জানালো যে, মোট বিশটি দরজা আছে।

ভেতরে ঢুকে রফিক অবাক হ'য়ে যায়। কী দামী দামী পাথর দিয়ে তৈরি মসজিদ! পাথরের গায়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য। মার্বেল পাথরের মেঝে। ছাদ থেকে ঝাড়বাতি ঝুলছে। মসজিদের ভেতরে খোলা চত্বর, মাঝখানে কালো ভেলভেটের গেলাপে ঢাকা কাবাঘর- পৃথিবীর সর্বপ্রথম এবাদতখানা।

কাবাঘরের প্রত্যেক কোণকে 'রোকন' বলা হয়- এ কথা জানে রফিক। সাফার সাথে ওরা এবার কাবাঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাখা 'হজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথরটির কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর সেই রোকন বরাবর দাঁড়িয়ে নিয়তের পর তাওয়াফ শুরু করে। সাফা সরবে আরবিতে তাওয়াফের দু'আ পড়তে থাকে, রফিকরা সাথে সাথে তা উচ্চারণ করে। এভাবে তারা সাতবার কাবাঘর প্রদক্ষিণ করল।

রফিক এই ঘোরার অর্থ কিছুই বুঝতে পারে না। সাফার আরবি দু'আও না। তবে কাবাশরীফের ভাব-গম্ভীর পরিবেশ, তার দেয়াল ও দরজা ধরে লোকজনদের ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না, আব্বা-আম্মার গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়া, এসব দেখে রফিক বুকের ভেতর কেমন একটা ব্যথা অনুভব করে। তার নিজের একটা অন্যায়ের কথা মনে পড়ে যায়।

গেল বছর সে পরীক্ষায় তিন নম্বরের জন্য প্রথম হতে পারেনি। প্রথম হয়েছিল সাজ্জাদ বলে একটি ছেলে। সে সাজ্জাদকে মনে মনে হিংসে করেছিল। ভেবেছিল পরীক্ষার আগে সাজ্জাদটার অসুখ হয়নি কেন? তাহলে তো সে আর প্রথম হতে পারত না। "আল্লাহ্, তুমি আমায় মাফ করে দিও। আমি আর কখনো এরকম খারাপ কথা ভাবব না, কাউকে হিংসে করব না।"

কাবাশরীফ সাতবার ঘুরে ওরা একটা কাচঘেরা ছোট ঘরের কাছে এসে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর একটা পাথরের ওপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর দু'পায়ের ছাপ। এই ঘরটিকে বলা হয় 'মাকামে ইবরাহীম'। এই পাথরের ওপর দাঁড়িয়েই ইবরাহীম (আঃ) কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন- এ কথাটা রফিক বহু আগে থেকেই শুনে আসছে।

কাবাঘরের দরজাটি অপূর্ব! হজ্রে আসওয়াদ ও কাবাঘরের এই দরজার মাঝের জায়গাটির নাম মুলতাযিম। "এখানে ও হেরেম শরীফের অনেক জায়গাতে দু'আ কবুল হয়।" ফিস্ফিস্ করে বলে সাফা।

www.amarboi.org

মাকামে ইবরাহীমের কাছে এসে সবাই দু'রাকাত নামায পড়লেন। কাছেই জমজমের কূয়ো। বিশেষ একটা দু'আ পড়ে ওরা কূয়োর পানি পান করেন।

কূয়োটি বেশ শক্ত দেয়াল ঘেরা ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছে। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কূয়ো থেকে ইঞ্জিনযুক্ত পাইপের মধ্য দিয়ে পানি তোলা হয়। তারপর তা অনেকগলো কলের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে বিতরণ করা হ'য়ে থাকে।

মেয়ে পুরুষের পানি নেবার স্থান পৃথক। মধ্যে একটা দেয়াল। রফিক শুনেছে, এই জমজমের পানি অফুরন্ত।

অনেকেই জমজম কূয়োর পবিত্র পানি প্লাস্টিকের পাত্র ভরে নিয়ে যাচ্ছে। আম্মাও একটা পাত্র এনেছেন। ঘরে ফেরার সময় পানি ভরে নিয়ে যাবেন।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে দৌড়

জমজম কূয়োর পানি খেয়ে রফিকরা সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সায়ী অর্থাৎ দৌড়াতে এল।

আসার পথে সাফা এই দুই পাহাড়ের কিছুটা বর্ণনা দিয়েছে। কাবাঘরের খুবই কাছের এই পাহাড় দু'টি পরস্পর উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত। দু'পাহাড়ের মাঝে আনুমানিক ষাট-সত্তর হাত ব্যবধান।

রফিক দেখল, জায়গাটা খুব লম্বা ও চওড়া। চমৎকার মোজায়িক করা, চারপাশে দেয়াল ও ওপরে ছাদ। "ওপর তলাতেও ঠিক এমনি বিরাট একটি ঘর আছে। বেশি ভিড় হ'লে সেখানেও সায়ী করা হয়।"

নিচতলায় সায়ী করবার লম্বা ঘরটার দু'দিকে কয়েক ধাপ উঁচু পাথরের ঢিবি রয়েছে। হাজিরা সেখানে উঠে, কাবাঘরের দিকে তাকিয়ে দু'আ-দরূদ পড়ছে।

"পাহাড় কোথায় সাফা ভাই?"

"ওই যে দেখছ, দুই দিকের শেষ সীমায় পাথরের ঢিবি, ও দু'টিই পাহাড়। আগে সবটাই পাহাড় ছিল। পরে হাজিদের দৌড়ানোর সুবিধার জন্য আসল পাহাড় ভেঙে ওরকম সমান করা হয়েছে।"

"আমরাও পাহাড়ে উঠব।"

"নিশ্চয়ই উঠবে!"

এই সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে সায়ী বা দৌড়ানোর পেছনে একটা ইতিহাস রয়েছে।

বর্তমানে আল্লাহর ঘর জাঁকজমকপূর্ণ ও তার চারপাশে লোকজনে ভরা। কিন্তু বহু বছর আগে এখানে লোকজনের নামগন্ধও ছিল না। ছিল কেবল ধূ ধূ করা বালুকারাশি। এখানেই ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর স্ত্রী বিবি হাজেরা (রাঃ)কে নির্জনবাস দিয়ে যান। তাঁর কোলে শিশু পুত্র ইসমাঈল (আঃ)। সাথে শুধু এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি দিয়ে গিয়েছিলেন।

খেজুর আর পানি অল্প ক'দিনেই ফুরিয়ে গেল। পানির অভাবে শিশুর মুখ কেবলই শুকিয়ে আসছে।

www.amarboi.org

চিৎকার করে কাঁদছে। বিবি হাজেরা (রাঃ) শিশু ইসমাঈলকে (আঃ) বালুর উপর শুইয়ে রেখে পানির খোঁজে পাগলিনীর মত ছুটোছুটি করছেন। দৌড়ে একবার সাফা পাহাড়ের দিকে যান, সেখানে কোথাও পানির সন্ধান মিলে কিনা! আবার দৌড়ে মারওয়া পাহাড়ের দিকে যান। এই দুই পাহাড়ের মাঝের জায়গাটাতে দৌড়াবার সময় চোখ থাকে সন্তানের দিকে। মাঝের জায়গাটি বেশ কিছুটা নিচুতে। এ স্থানের নাম বাত্‌নুল ওয়াদী। এখান থেকে শিশুকে দেখা যেত না বলে তিনি এ জায়গাটা দৌড়ে পার হতেন। এভাবে সাতবার দু'পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করার পর অবাক হ'য়ে দেখেন, শিশু ইসমাঈল (আঃ)-এর পায়ের আঘাতে ভেতর থেকে মাটি ফুঁড়ে পানি উথলে উঠছে। বিবি হাজেরা (রাঃ) দৌড়ে এসে সেই পানির উৎসের চারদিকে বালুর বাঁধ দিলেন, মশক ভ'রে পানি নিলেন, শিশুকে পানি পান করিয়ে বাঁচালেন ও নিজে বাঁচলেন। এই হ'ল আবে জমজমের উৎপত্তির ইতিহাস। বিবি হাজেরার সেই কষ্টকর ছুটোছুটির কথা মনে করে এই সায়ী বা দৌড়ানোর রেওয়াজ।

সায়ী করবার পর আব্বা ও রফিক ছোট করে চুল ছেঁটে নিলেন। চুল ছাঁটা ও মাথা ন্যাড়া করবার জন্য লোকেরা ক্ষুর-কাঁচি নিয়ে বাইরে বসে আছে।

আব্বা রফিকের আম্মার আধ ইঞ্চিখানেক চুল কেটে দিলেন।

এরপর সবাই শুকরিয়া নামায পড়লেন।

"এবার সবাই এহ্‌রাম ভাঙতে পারেন। কারণ আপনাদের ওমরা হ'য়ে গেল।"

"ওমরা কী সাফা ভাইয়া?"

"ঐ যে হেরেমের সীমানা, যাকে বলে মিকাত, সেখান থেকে এহ্‌রাম বেঁধে এসে কাবাঘর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়া পাহাড়ে সায়ী করা হ'ল, এটাই ওমরা।"

কালো পাথর

বাড়ি ফেরার পথে রফিক কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা সাফা ভাইয়া, আমরা যে তাওয়াফ করার সময় 'হজ্‌রে আস্‌ওয়াদ' মানে কালো পাথরটিকে চুমু খেলাম, আসলে সেটি কী?"

"সেটি- আমার আব্বাজানের কাছ থেকে জেনেছি, সেটি একটি বেহেশতি পাথর। কথিত আছে পৃথিবীতে এসে আদম (আঃ) যখন কাবাঘর নির্মাণ করেন, তখন আল্লাহ্‌ তায়ালা নিজেই অনুগ্রহ করে তাঁকে এই পাথরখানা দান করেছিলেন। এতে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর হাতের ছোঁয়া রয়েছে। পাথরটিকে সম্মানের সাথে কাবাঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রাখা হয়েছে। আদিকাল থেকে এটি সকল গোত্রের লোকদের কাছে পরম শ্রদ্ধার বস্তু বলে বিবেচিত হ'য়ে আসছে। যদিও পাথরটি বেহেশতের, তবু একে শুধুমাত্র পাথর বলেই ধরা হয়। এমন কি সেই পুতুল পূজার যুগেও এ পাথরটিকে কখনো পূজা করা হয়নি। সে জন্য মক্কা বিজয়ের পর নবী করিম (সাঃ) যখন কাবাঘরের ভেতর থেকে লাত্‌, ওয্‌যা, মানাত্‌ এসব নামের মূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলেন, এ কালো পাথরটিকে সরাননি।

www.amarboi.org

হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে সর্বপ্রথম যখন হজ্ব প্রথা প্রচলন করেন, তাওয়াফ করার সময় ঐ পাথরের কাছ থেকেই যাত্রা শুরু করেন। পুরা কাবাঘরটি ঘুরে সেটির কাছে উপস্থিত হ'লে একবার তাওয়াফ করা হল বলে ধরা হয়। এভাবে দেখলে তো আমরা কাবাঘরের চারদিকে সাতবার ঘুরলাম ও হজ্‌রে অস্‌ওয়াদকে চুমু খেলাম।"

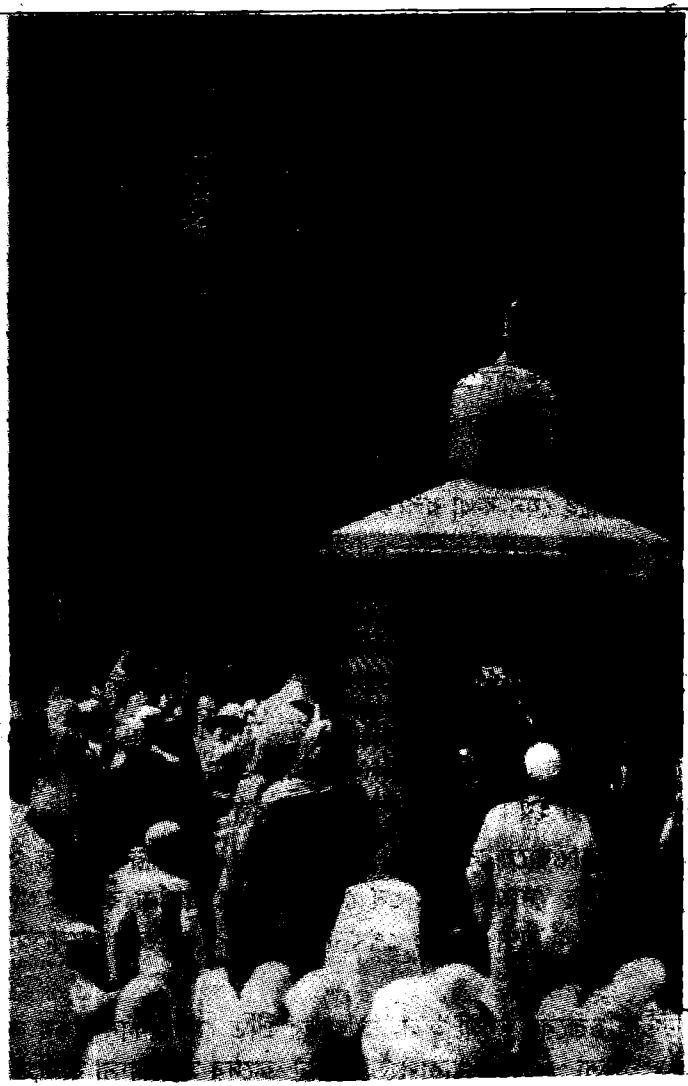

মাকামে ইবরাহীম। কাঁচঘেরা এই ঘরটির মধ্যে একটি পাথরের ওপর ইবরাহীম (আঃ) এর দুই পায়ের ছাপ রয়েছে

আম্মা এ প্রসঙ্গে যোগ করলেন, "আমি হাদীস শরীফে পড়েছি, একবার হজ্বের সময় দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ), তাঁর আশে-পাশে জড়ো হওয়া লোকদের শুনিয়ে, কালো পাথরটিকে চুমু খেয়ে বলেছিলেন, 'হে পাথর আমি ঠিক জানি যে তুমি একখন্ড পাথর মাত্র। কারো উপকার বা অপকার করার কোন শক্তিই তোমার নেই। তবে আমার নেতা রাসূলে করিমকে দেখেছি তোমাকে চুমু খেতে, তাই আমিও তোমাকে চুমু খাচ্ছি।' আমরাও সে কারণে পাথরটিকে চুমু খাই।"

ইতোমধ্যে তারা বাড়ির কাছে চলে এসেছে।

www.amarboi.org

মক্কা রফিকদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যায়।

এখন ঘর-দোর গুছানোর পালা। রফিক আব্বা-আম্মার সাথে ছুটোছুটি করে কাজ করছে। গুছানো হ'লে পর তারা আবার 'ওমরা' করবেন। এবার ওমরার নিয়ত, দেয়া সব কিছুই বই দেখে বাংলায় পড়বেন।

ওমরা করতে হ'লে 'মিকাতে'র বাইরে যেতে হয়। তিন দিন পরেই রফিকরা মক্কা থেকে পাঁচ, ছ' মাইল দূরে তানিম বলে একটা জায়গায় এল। বিবি আয়েশা (রাঃ) এর নামে এখানে একটি নতুন মসজিদ তৈরি করা হয়েছে। এখান থেকেই তারা ওমরার উদ্দেশ্যে 'এহ্‌রাম' বেঁধে হেরেম শরীফে কাবাঘর তাওয়াফ করতে এল।

আব্বা বই দেখে বাংলায় দু'আ পড়ে তাওয়াফ করতে শুরু করেছেন। আম্মা ও রফিক সাথে সাথে সে সব দু'আ বলে যাচ্ছেন। কী যে ভাল লাগছে রফিকের! নিজের ভাষায়, মন উজাড় করে দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে যেন কথা বলছে।

তাওয়াফের সময় যেসব দু'আ পড়লেন, তার যে যে অংশ রফিকের মনে গেঁথে রইল, তা'হল-

প্রথমবার ঘুরবার সময় আল্লাহ্ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করে, তাঁর প্রশংসা করা হ'ল এবং রাসূলে করিম (সঃ) এর জন্য দরূদ ও সালাম জানানো হ'ল। বলা হল, আল্লাহ্‌র ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তাঁর আদেশকে সত্য জেনে, নবী করিমের সুন্নতের অনুসরণের উদ্দেশ্যেই এই তাওয়াফ করা।

প্রথম চক্করের দু'আ শেষ ক'রে, সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা হ'ল যেন এই জগতে এবং পরের জগতে সবার জন্য কল্যাণ দান করা ও দোজখের আগুন থেকে সবাইকে যেন রক্ষা করা হয়। তাদের দু'আ যেন কবুল হয়।

দ্বিতীয় তাওয়াফে বলা হ'ল যে, কাবাঘর ও হেরেম শরীফ আল্লাহ্‌র দান এবং এই স্থানে মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে দোযখের আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আল্লাহ্ যেন তাদের মনে ঈমান দেন, অন্যায় কাজকে ঘৃণা করতে শেখান এবং যাঁরা সত্যের পথে আছেন, তাঁদের যেন সেই দলে রাখা হয়।

তৃতীয় চক্করের দু'আ হ'ল- আল্লাহ্‌র প্রতি যেন কোন রকম সন্দেহের ভাব তাদের মনে না জাগে এবং কপটতা ও কোন খারাপ ভাব যেন তাদের মনে বাসা বাঁধতে না পারে।

এখানে পরিবারের সকলের মঙ্গল কামনাও করা হ'ল। রফিক মনে মনে তার দাদির অসুখ থেকে সেরে উঠার জন্য দু'আ চাইল।

চতুর্থবারের সময় আব্বা পড়লেন, আল্লাহ্ যেন তাদের এই ওমরা কবুল করেন। তিনি তাদের যা খাওয়া-পরা দিচ্ছেন, তাতে যেন তারা সন্তুষ্ট থাকে।

পঞ্চমবারের তাওয়াফের সময় আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আবার আশ্রয় চেয়ে, রাসূলে করিম (সাঃ) আল্লাহ্‌র কাছে যে কল্যাণ চেয়েছিলেন তারাও তা চাইলেন এবং যে কথা ও কাজ তাদের বেহেস্তের কাছে নিয়ে যেতে পারে, তাই তাঁর কাছে ভিক্ষে চাওয়া হ'ল।

www.amarboi.org

ষষ্ঠবারের তাওয়াফের কথা ততটা রফিক বুঝল না। তবে একটু বুঝল যখন তার আব্বা পড়লেন, "হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে হালাল কামাই দিয়ে হারাম থেকে বাঁচাও!" এর মধ্যে একটা কথা রফিকের খুব ভাল লাগল। অন্যের কাছে যা'তে হাত পাততে না হয়, তার জন্য আল্লাহ্ যেন অনুগ্রহ করেন।

শেষ তাওয়াফের কথাগুলোও রফিকের ভারি চমৎকার লাগল। সত্যিকারের ঈমান, সৎ উপার্জন, আন্তরিকভাবে তওবা চেয়ে করুণাময়ের কাছে জ্ঞান বাড়িয়ে দেয়ার ও পুণ্যবানদের মধ্যে তাদের শামিল করার অনুরোধ।

মুলতাযিমের কাছে এসে আব্বার সাথে রফিক ও তার আম্মা বাংলায় লম্বা একটি দু'আ পড়লেন।

প্রথম দিনের মতো আজকেও তারা মাকামে ইবরাহীমের কাছে দু'রাকাত নামায পড়েন। এরপর জমজমের পানি খেয়ে 'সায়ী' করতে যান।

'সায়ী' করতে এসে রফিক আজ আব্বা-আম্মার সাথে বাংলায় যে সব দু'আ উচ্চারণ করলো তা সংক্ষেপে হ'ল-

প্রথম দৌড়ে আল্লাহ্ তায়ালা যে এক, এ বিশ্বাস দৃঢ় রেখে, তাঁর উচ্চ প্রশংসা করে, তাঁর কাছে নিজেদের পাপ দূর করে দেবার জন্য খুব কাতরভাবে মাফ চাওয়া হ'ল।

দ্বিতীয় দৌড়েও আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস রেখে প্রার্থনা করা হ'ল- "হে আল্লাহ্! তুমি কুরআনে বলেছ, আমাকে ডাক, আমি সাড়া দেব।" আমি তোমার জন্য 'সায়ী' করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও! তুমি তো প্রতিজ্ঞা ভাঙনা! তোমার উপরই আমাদের একমাত্র ভরসা। ঈমানদারদের মতো আমাদের মরণ দিও।"

তৃতীয় ও চতুর্থবারের দৌড়ের আবেদন হল- তাদের ঈমানকে যেন পরিপূর্ণ করে দেয়া হয় ও সত্যের পথ দেখবার পর তাদের মত যেন কোনদিন বদলে না যায়। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে তাঁর প্রেরিত রাসূল তা যেন মন প্রাণ দিয়ে স্বীকার করতে পারে।

পঞ্চম বারের সময় অন্যান্য কথার সাথে বলল, "হে আল্লাহ্, খারাপ কাজ, তোমার প্রতি অবিশ্বাস ও অবাধ্যতাকে আমাদের কাছে ঘৃণ্য করে দাও।"

রফিক দেখল তার সামনে, তার চেয়েও বয়সে ছোট ফুটফুটে সুন্দর একটি ছেলে তাওয়াফ করছে। ওর দিকে তাকিয়ে সে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। চমক ভেঙে শুনল আব্বা পড়ছেন- "হে আল্লাহ! আমার মনকে, আমার শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিকে এবং আমার জবানকে তোমার নূরের আলোকে আলোকিত করে দাও!"

রফিক অনেকটা না বুঝেই আব্বার সাথে কথাগুলো আওড়ালো।

ষষ্ঠ দৌড়ের দু'আতেও আল্লাহ্ যে এক সে কথা স্বীকার করে নানানভাবে তাঁর প্রশংসা করে, তাঁর কাছে সব রকম পাপের জন্য মাফ চাওয়া হ'ল।

সপ্তম সায়ীতেও আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাখ্যা করে, তাঁর কাছে তাদের ঈমান ঠিক রাখার জন্য অনুরোধ করা হ'ল। এ দু'আয় রফিকের একটা কথা খুবই ভাল লাগল। "হে আল্লাহ্! তুমি প্রত্যেক

www.amarboi.org

মানুষের মনের গোপন কথা জান, তোমার কাছে না গিয়ে কারো উপায় নেই। তুমি আমাদের সমস্ত কাজকে সহজ ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে দাও। দয়া করে আমাদের সকল আশা-আকাঙ্খা পরিপূর্ণ কর।"

পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম এই তিনটি দু'আর শেষের দিকে একই কথা বার বার বলা হয়েছে। তাহ'ল- "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন স্বরূপ, তাই যে কাবাঘরে হজ্ব বা ওমরা করে তার পক্ষে এই নির্দশন দু'টির তাওয়াফ করায় কোন দোষ নেই। কেউ নিজের ইচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা জানেন এবং তার কদর করেন।"

বাসায় ফিরে দেখে, আহমদ সাফা বারান্দায় বসে আছে। খুশিতে রফিকের দু'চোখ চিক্‌চিক্ করে ওঠে। আজকের তাওয়াফ ও সায়ী যে সে অর্থ বুঝে করেছে, এ খুশির খবরটা সে তার সাফা ভাইয়ার কাছে খুবই উচ্ছাসের সাথে প্রকাশ করল।

সাফা বলে, "ঠিক বলেছ ভাইয়া! নিজের ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় না বুঝে কিছু বললে বা চাইলে মনে তৃপ্তি পাওয়া যায় না।"

ভেতরে গিয়ে রফিক ও তার আব্বা- আম্মা এহ্‌রামের পোশাক খুলে তারপর বসবার ঘরে এল।

সম্পদ

সেই তানিমে যাবার পর থেকেই রফিকের মনে বার বার একটা প্রশ্ন জাগছে।

আজ সাফা তাদের বাসায় এলে সে তার কাছ ঘেঁসে বসল। "আচ্ছা সাফা ভাইয়া, তানিমে বিবি আয়েশা (রাঃ)র মসজিদের বারান্দা থেকে দূরে দেখলাম অনেক উঁচু, বিরাট গোল আকারের ঘরের মত কী সব! ঘরগুলো রুপালি রঙের। সূর্যের আলোকে কী চমৎকার ঝলমল করছিল! ভারি সুন্দর! ওগুলো কী সাফা ভাই?"

"ওগুলো সব খনিজ তেলের ট্যাংক। ভেতরে তেল রাখা হয়। শুধু তানিমে না, সউদি আরবের অনেক জায়গাতেই ওরকম ট্যাংক আছে।"

আব্বা ড্রইংরুমে বসে আছেন। আম্মাও বৈদ্যুতিক চুলোয় চায়ের কেটলি চড়িয়ে সোফায় এসে বসলেন।

সাফা আব্বার দিকে তাকাল।

"জানেন চাচা, মাত্র সাতচল্লিশ বছর আগে সউদি আরবে প্রথম খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, আমিও তা শুনেছি। এখন থেকে প্রায় একুশ বছর আগে সউদি আরব ও যুক্তরাষ্ট্র মিলে এখানকার ভূতাত্ত্বিক জরিপের কাজ শেষ করে। এখানেই নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তেল মজুদ আছে। আর, এই তেল সম্পদ আরো ৬৫/৬৬ বছর থাকবে বলে হিসেব করা হয়েছে।"

"জ্বি চাচা, এই তো ১৯৭৮ মানে চার বছর আগে সউদি আরব তেল রপ্তানি করে ৩,৫২০ কোটি

www.amarboi.org

ডলার আয় করেছে। তাছাড়া প্রচুর গ্যাসও মজুদ আছে। এই তেল ও গ্যাস সম্পদের ফলে সউদি আরব এখন দুনিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশ। তেল ও গ্যাস ছাড়াও এখানে আছে সোনা, রূপা ও লোহার খনি।"

অবাক হ'য়ে রফিক এসব কথা শোনে। বাস্তবিকই নবীর (সঃ) দেশে আল্লাহ্ কত রকম সম্পদ দিয়ে রেখেছেন!

খোলা জানালা

রফিক মিসফালাহ্ এলাকার পথ-ঘাট, অলি-গলি, দোকান, বাজার, মসজিদ, তাদের বাসা থেকে হেরেম শরীফ পর্যন্ত পথ, সব চিনে নিয়েছে। এ এলাকায় এখন ভাঙা-গড়ার কাজ চলছে।

পাশের বাসার সেলিম চাচার সাথে আব্বার ও নাজমা চাচির সাথে তার আম্মার বেশ পরিচয় হ'য়ে গেছে। ত্রিশ বছর আগে তারা বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছে। তাঁদের ছেলেমেয়েদের চেহারা ও রঙে এদেশের ছাপ পড়েছে। নাতি-নাত্নিদের তো বুঝবারই উপায় নেই যে তারা এ দেশের আদি বাসিন্দা নয়।

সেলিম চাচা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটেন। সেদিন রফিক শুনল, আব্বাকে তিনি বলছেন, "একটা অফিসে ভালই চাকরি করতাম। হঠাৎ একদিন এ্যাকসিডেন্টে খোঁড়া হ'য়ে গেলাম। তারপর অবশ্য একেবারে পানিতে পড়িনি। আমি এখন পঙ্গু ভাতা পাচ্ছি।"

"পঙ্গু ভাতা?"

"হ্যাঁ, যে-সব লোকেরা অসুস্থতার জন্য বা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে কাজ করতে পারে না, তারা সরকারের তরফ থেকে পেন্সন পান। নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সরকারের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হয়। সরকারের তরফের কর্মচারীরা তা যাচাই করে তাদের কার্ড দেন। তাতে শারীরিক অবস্থানুযায়ী তিনি কতটুকু সাহায্য পাবেন, তার উল্লেখ থাকে। এ ব্যাপারে শহর ও গ্রামের একই রকম নিয়ম ও ব্যবস্থা।" শুনে আব্বা চমৎকৃত হলেন।

সেলিম চাচার সবচেয়ে ছোট ছেলেটি মোটেই বাংলা বলতে পারে না। প্রায় রফিকের বয়সী। প্রথম দিন দেখা হবার সাথে সাথেই এগিয়ে এসে মৃদু হেসে হাত তুলে বলেছিল, 'সাবাহাল খায়ের!" রফিক জানত না যে কথাটার মানে হ'ল সুপ্রভাত। তবে ভাবেসাবে বুঝল ছেলেটি তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। রফিক হাত তুলে বলল, "আস্সালামু আলাইকুম!" খুশি হ'য়ে প্রত্যুত্তরে সে যে কথাটা বলল তার সাথে রফিক খুব পরিচিতি। "ওয়া আলাইকুম্ আস্সালাম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু!" এরপর রফিক শুনল একটি প্রশ্ন, "এশ্ এছ্মাক্?" রফিক আরবি জানে না। সে হাত উলটালো।

ইশারা বুঝে নিয়ে ছেলেটি নিজের বুকে হাত রেখে বলে, "ইস্মি তবশির, শেখ তব্শির।"

রফিক এবার বুঝতে পারে। সেও নিজের বুকে হাত রেখে জবাব দেয়, "ইস্মি রফিক।"

"রফিক? রফিক? আন্তা রফিগি- তুমি আমার বন্ধু।" খুশি হ'য়ে তবশির রফিকের হাত ধরে।

www.amarboi.org

রফিকদের বাসার গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আজ ওরা দু'জনে ইশারায়, দু'একটি আরবি শব্দ ব্যবহার করে কথা বলছে। ভেতর থেকে আম্মার ডাক শোনা গেল।

"উম্মিইয়া ডাকছেন" রফিক ইশারা করে বাড়ির দিকে দেখাল। ডাকছেন- শব্দটার আরবি জানে না রফিক। তবশির কিন্তু ভাবেসাবে তা বুঝে নেয়। হেসে বলে, "রোহ্-যাও!" তারপর হাত নাড়ে, "আলবেদা- বিদায়!"

ভেতরে এলে আম্মা বললেন, "তোর আব্বার তো বাজার করবার সময় হচ্ছে না! চল্ আমরা দু'জনে বাজার থেকে কিছু সবজি ও ফল কিনে নিয়ে আসি!"

"চল, চল!" রফিক খুব উৎসাহিত হ'ল। চট করে পোশাক বদলে নিল সে।

নতুন দেশে এসে আম্মার কাজ অনেক বেড়ে গেছে। ঢাকার মতো এখানে কাজে সাহায্য করবার লোক নেই। তাই রফিকই আম্মাকে ছোটখাটো অনেক কাজে সাহায্য করে। বাইরে বের হবার আগে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল রফিকের। ওহ্ হো! তার ঘরের জানালাটা তো এখনো বন্ধ করা হয়নি! ঢাকায় বাসা থেকে বাইরে যাবার আগে আব্বা-আম্মা পাছে চুরি হয়ে যায়, এই ভয়ে সব সময় জানালাগুলো বন্ধ করে যেতেন।

এখানকার ঘরগুলোতে ঢুকবার কোন অসুবিধাই নেই। কারণ অধিকাংশ বাসাতে জানালায় কোন শিক নেই।

জানালা বন্ধ করতে গিয়ে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে নজর পড়ে রফিকের। ধাপে ধাপে উঠে গেছে। পাহাড়ের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু কাঁটা জাতীয় গাছ।

আম্মা দুটো বাজারের ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এলেন। একটা রফিকের দিকে এগিয়ে দিলেন।

"চল্, আছরের আযানের আগেই ফিরতে হ'বে।"

প্রথম ধাপের নিচে, গলির মোড়ে একখন্ড সমতল জমি। চার-পাঁচজন ছোট ছেলে বল খেলছে। সবাই বেশ ফরসা ও সুন্দর। ওরা রফিককে দেখিয়ে হাসি হাসি চোখে নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করে।

মোড় ঘুরবার ফাঁকে একবার পেছন ফিরতেই রফিক দেখে, ওদের একজন জিব বের করে মুখ ভেংচাল। ভারি রাগ হ'ল রফিকের। "দেখেছ আম্মা, কী পাজি ওই ছেলেটা! আমাকে মুখ ভেংচাল!"

আম্মা তখন রিষ্টওয়াচে সময় দেখছেন। সে দিকে চোখ রেখে বললেন, "মুখ ভেংচালে ওর মুখই খারাপ দেখাবে। তোমার কিছু হ'বে না।"

বেশ কিছুক্ষণ পর তারা বড় রাস্তায় নামল। ট্যাক্সি-গাড়ি চলছে। লোক চলাচলও যথেষ্ট।

দু'পাশে বিভিন্ন ধরনের সুন্দর, সাজানো দোকান। কাপড়ের, সোনার গহনার, ঘড়ি, রেডিও, টিভি, ওষুধ, খেলনা, প্লাস্টিকের ফুল, ছবি, তসবিহ্, জায়নামাজ আরো কত কী! রেডিও ও ঘড়ির যেন ছড়াছড়ি। প্রত্যেকের হাতেই একটি ক'রে রিষ্টওয়াচ।

"আম্মা আমাকে গল্পের বই কিনে দাও না!"

কী করে আম্মা রফিকের আবদার রাখবেন? এই এলাকার বাজারে বাংলা বই তো দূরের কথা,

www.amarboi.org

ইংরেজি গল্পের বইও নেই। যা আছে, সব আরবিতে লেখা।

আর ক'টা দিন সবুর কর মানিক! একটু গুছিয়ে নিয়ে বইয়ের বড় বাক্সটা খুলব। তোমার জন্য অনেক বই এনেছি।"

রফিকরা সবজির বাজারে এল। নানান রকম সবজিতে বাজার বোঝাই। ফলও প্রচুর! আপেল, মাল্টা, আঙুর, নাসপাতি, বেদানা, তরমুজ, ফুটি কোন কিছুরই অভাব নেই। পুঁইশাক-ধনেপাতা থেকে শুরু করে সব রকম তরকারি তাজা অবস্থায় পাওয়া যায়। সেদিন সাফা ভাই বলছিল যে, মক্কা থেকে ৪৪ মাইল দূরের তায়েফ থেকে উদ্ভিদ জাতীয় সবই বাজারে আসে। মাছ যা- সব সমুদ্রের। শুঁটকিও তাই। সব জিনিসই বেশ সস্তা, কেবল মুরগি ছাড়া। মুরগি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

আজকাল সউদিরা কৃষি কাজ বেশ ভালভাবেই করছে। আলীম চাচা বলছিলেন যে, এদের অনেকের ক্ষেতে ঢুকলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। মাটি উঁচু করে তৈরি বেডে সারি সারি চমৎকার সব সবজি গাছ। বেডের পাশে পানির জন্য নহর কাটা। অবশ্য অনেক বাড়িতেই ডিপ্ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। সউদিরা মিষ্টি কুমড়ো খেতে ভালবাসে। তাই এর চাষও হয় প্রচুর। লাল্‌চে রঙের সুন্দর মিষ্টি কুমড়োয় বাজার ভরা থাকে।

আম্মা ভাঙা ভাঙা আরবিতে দোকানিকে বললেন, "হাতেনি বাতাতিশ, ফুল্, ফিল্‌ফিল্ আখ্‌দার, বাছাল, বেরতাকাল ওয়া তুফ্যাহ্। আমাকে গোলআলু, শিম, কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ, কমলালেবু ও আপেল দিন।"

দোকানে জিনিস নিয়ে কোনো দামাদামি নেই। ব্যবসায়ে সউদিরা খুব সৎ। দোকানি বলে, "ওয়াহেদ কালাম– এক কথা, এক দাম।" তবে ফেরিওয়ালাদের দরাদরি করতে দেখেছে রফিক।

দুই ব্যাগ বোঝাই করে ওরা যখন সদর রাস্তায় নামল, মসজিদ থেকে তখন আযানের সুর ভেসে আসছে। সাথে সাথেই দোকানিরা দোকানের কাজ বন্ধ করে নামাজের জন্য চলে যেতে থাকে। শুধু মাত্র লম্বা একটা কাপড়ের ঘের দেয়া, দামী দামী জিনিষপত্র সব পড়ে রইল। "আম্মা দেখেছ, দোকানগুলো কেমন খালি পড়ে রইল। কোন পাহারাদার নেই তো!"

"পাহারাদার না থাকলেও কেউ কোন জিনিস চুরি করে না এখানে।"

"সাফা ভাইয়া তো ঠিকই বলেছিল। আচ্ছা আম্মা, কী ক'রে অমন ভাল হ'ল ওরা?"

"কী করে এত ভাল হ'ল, তাতো বলতে পারি না বাবা। তবে আমার মনে হয় ওরা এমন একটা কিছু পেয়ে গেছে, যা কেবল মানুষকে সৎ, সুন্দর আর পুণ্যের পথ দেখায়। খোলা জানালায় মনের দৃষ্টি দিয়ে তাই ওরা দেখে উদার আকাশ। কল্পনায় আকাশে দেখে খোদার আরশ।"

আম্মার কথাগুলো বেশ কঠিন! তিনি তার সাথে এমন ভাষায় কোনদিন কথা বলেন না। আজ মনে হচ্ছে তাঁর মনটা আবেগে ভরা। কথাগুলো কিন্তু রফিকের শুনতে ভারি ভাল লাগে আর একটু বুঝতে পারে, আম্মা বলেছেন যে, আল্লাহ্‌কে সত্যি সত্যি ভয় পায় বলে এখানকার লোকেরা চুরি করে না।

www.amarboi.org

রফিকের আনন্দ আর ধরে না। আজ ঘুরে ঘুরে মক্কার দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখবে।

সাফা ভাই গাড়ি নিয়ে এসেছে।

আম্মা সকাল থেকেই সংগে কী কী নেবেন তার যোগাড়যন্ত্র করছেন। প্লেট, গ্লাস, মুখবন্ধ পাত্রে পানি, চাদর, জায়নামাজ, কয়েক রকম ফল, আর টিফিন ক্যারিয়ারে দুপুরের খাবার। এত সব সাথে নিতে দেখে সাফা বলল, "চাচি তো দেখি রীতিমতো একটা পিক্‌নিকের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন! জানেন চাচি, মক্কার লোকেরা পিকনিকে যেতে খুব ভালবাসে।"

রফিকরা অবশ্য আজ ঠিক পিকনিকের উদ্দেশ্যে বের হচ্ছে না। শহরের কিছু দূরের জায়গাগুলো দেখতে যাবে বলে সাথে খাবার নেবার ব্যবস্থা।

মক্কায় এসে তাদের বাসার কাছাকাছি যা দেখবার, পায়ে হেঁটেই তারা তা দেখে নিয়েছে।

প্রথমেই দেখতে গিয়েছিল, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর জন্মস্থান মওলুদুন্নবী। হেরেম শরীফের খুব কাছেই।

"নবী করিম (সঃ) যে ঘরে জন্মেছিলেন, আগে সে ঘরটি খোলা ছিল। সবাইকে ঢুকতে দেয়া

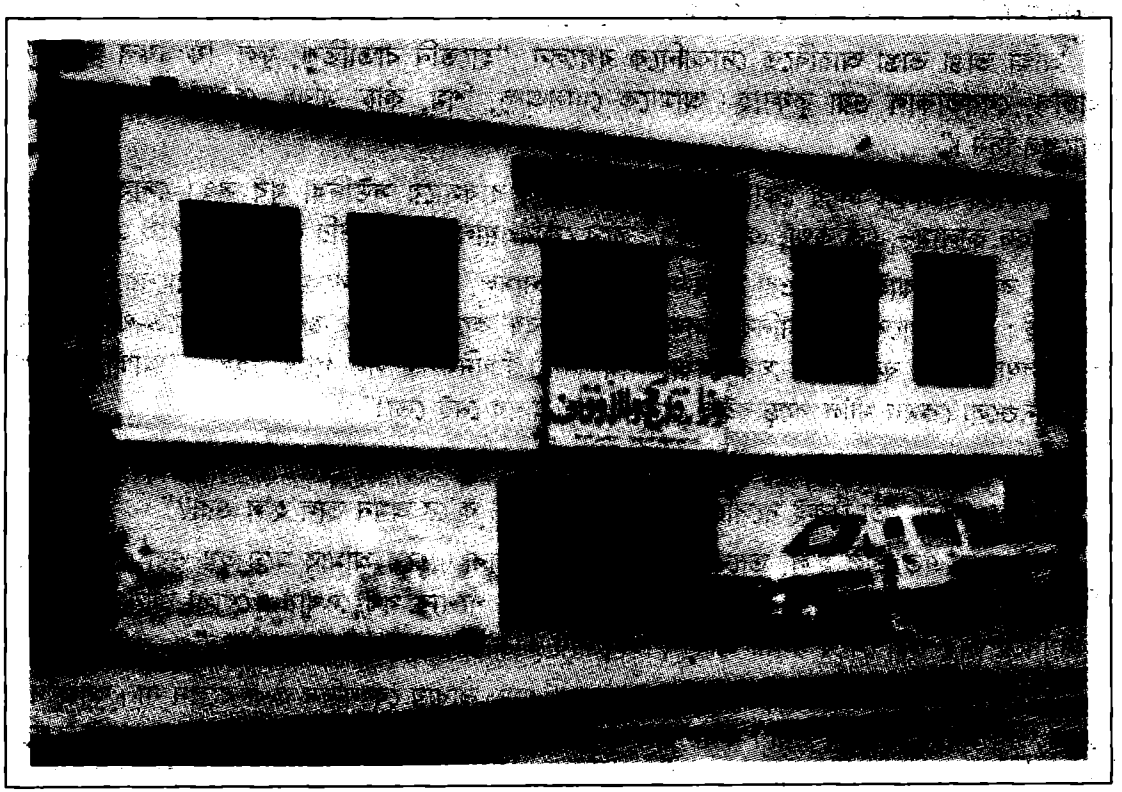

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে বাড়িতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন

www.amarboi.org

হতো। কিন্তু পরে তা বন্ধ রাখা হয়। কারণ কি জান ভাইয়া?" বলেছিল সাফা, "লোকেরা অতিরিক্ত ভক্তির আবেগে সেই ঘরে সেজদা করতো, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। এখন এটি একটি লাইব্রেরি।"

তারা মসজিদে কাফ্‌শ দেখে এসেছে। হেরেম শরীফের কাছেই মক্কার একটি বিখ্যাত বাজার রয়েছে। মসজিদে কাফ্‌শ সেই বাজারের ওপরেই। এখানেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)কে কুরবানি করবার জন্য গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন।

মক্কার সবচেয়ে বড় ও অতি পুরনো গোরস্থান জান্নাতুল মা'আলা। তারা তাও দেখে এসেছে। মক্কা শরীফে কোন হজ্বযাত্রী মারা গেলে, তাকে এ গোরস্থানেই দাফন করা হয়।

রফিকের আম্মা জান্নাতুল মা'আলার গেটের ভেতর ঢুকে, সেখানে মেয়েদের বসবার জায়গায় গিয়ে দু'আ দরূদ পড়ছিলেন। রফিক তার আব্বা ও সাফা ভাইয়ের সাথে গোরস্থানের ভেতর ঢুকেছিল। নবী করিম (সঃ) এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব, চাচা আবুতালিব, হযরত (সঃ) এর প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রাঃ) ও আরো অনেকের কবরের কাছে গিয়ে দেখল ও কবর জিয়ারত করল। এতো বিখ্যাত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কবর, অথচ অতি সাধারণ। কোন গাঁথুনি দিয়ে বাঁধানো নেই। শুধুমাত্র সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বিবি খাদিজা (রাঃ) এর কবরটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করা আছে।

আজ ওরা প্রথমেই যাবে জাবালে সূরে ও পরে গারে হেরায়। তারপর আরো কয়েকটি জায়গায়।

আব্বার ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানো প্রয়োজন। "আগে ব্যাংকে চল সাফা! ট্রাভেলার্স চেক ভাঙাব।"

"ব্যাংক এতো তাড়াতাড়ি খুলবে না চাচা! তার চেয়ে চলুন, কোন প্রাইভেট দোকান থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আসি।"

"প্রাইভেট দোকান! সেখানে ভাঙানো যাবে কী করে?" আব্বা অবাক হ'য়ে গেলেন।

"চলুন না দেখবেন! যারা এই টাকা লেনদেন করেন, তাদের কি বলা হয় জানেন? –সর্‌রাফ্‌।"

বাজারের কাছেই রাস্তার ধারে বেশ কয়েকজন সর্‌রাফের দোকান। রফিক দেখল দোকানগুলো তাদের দেশের পান-বিড়ির দোকানের মতো ছোট। একেকটা চৌকির ওপর সর্‌রাফেরা বসা।

অবাক হ'য়ে গেল সবাই। দেখে, সর্‌রাফের সামনে পৃথিবীর প্রায় সব রকম মুদ্রা সাজানো। গোছা গোছা নোট। একটু উঁচুতে দড়ি টাঙিয়ে, তাতে ক্লিপ দিয়ে এঁটে, ঝুলিয়ে রাখা হ'য়েছে সউদি ও অন্যান্য দেশের নোট। চৌকির পেছনে একটা টেবিল। টেবিলে বহু নোটের গাদা থরে সাজানো। আর সাজানো রয়েছে চকচকে সোনার ইট। বড়গুলো একেকটা তাসের চেয়েও আকারে বড় হবে। প্রত্যেকটার গায়ে ওজনের ছাপ।

সাফা ভাইয়া তার পরিচিত একটা দোকান থেকে আব্বার চেক ভাঙিয়ে সউদি রিয়াল নিল। সর্‌রাফের দিকে লজ্জিত চোখে তাকিয়ে রফিক সাফা ভাইকে অনুরোধ জানাল,

"একটা ইট ধরে দেখব, সাফা ভাইয়া?"

সাফা আরবিতে, সর্‌রাফকে সে কথা বলতে, তিনি হেসে তিনটা সোনার ইট এগিয়ে দিলেন। 'দেখুন না! তাতে কী!'

www.amarboi.org

ওরা তিনজনে সোনার ইটগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল। বিস্ময় ও আনন্দে বেশ কিছুক্ষণ মগ্ন হ'য়ে রইল।

গাড়িতে উঠে আব্বা প্রশ্ন না করে পারলেন না। "আচ্ছা, এই যে এতো টাকা আর সোনার স্তূপ, কোন দোকানে পুলিশ বা গার্ড তো দেখলাম না!"

"কিছুই লাগে না চাচা। নামাজের আযান পড়লে সামনের অতি সাধারণ একটা দরজা টেনে দিয়ে, সস্তার একটা তালা ঝুলিয়ে ওরা চলে যায়। এ দরজা কিন্তু অতি সহজেই ভেঙে ভেতরে ঢোকা যেতে পারে।" ... এত্তো টাকা এমনি পড়ে থাকে, অথচ কী আশ্চর্য। কেউ তাতে ভুলেও হাত দেয় না। এ দেশের লোকেরা কী ক'রে এমন অদ্ভুত সংযত হবার দীক্ষা পেল, ভাবতে সবারই ভীষণ অবাক লাগে।

জাবালে সূরে ও জাবালে নূরে

মক্কা শরীফ থেকে মাইল দুয়েক দূরে মিস্‌ফালাহ্ মহল্লার দক্ষিণে জাবালে সূর অর্থাৎ সূর পাহাড় অবস্থিত। প্রায় এক মাইল উঁচু এই পাহাড়ের নিচে এসে সাফা গাড়ি থামাল। এতেই রয়েছে গারে সূর অর্থাৎ সূর গুহা।

আব্বা সূর পর্বতের বিশেষ একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন। "এই সূর পাহাড়ের গুহার মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মাক্কা থেকে মদীনাতে হিযরত করবার সময় মানে নিজের দেশ ছেড়ে মদীনাতে থাকবার জন্য রওয়ানা দিয়ে কাফেরদের ভয়ে পালিয়ে তিন দিন লুকিয়ে ছিলেন। সঙ্গী ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ)। সে সময়ে একবার এমন হ'য়েছিল যে, তাঁদের খুঁজতে খুঁজতে শত্রুরা একদম গুহার কাছে এসে পড়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র কী মেহেরবানি! ঠিক সে সময় কয়েকটা মাকড়সা সেই গুহার মুখে ঘনভাবে জাল বুনে ফেলে। এ সময়েই আবার একটি কবুতর এই গুহার মুখে বাসা করে, ডিমে তা দেয়া শুরু করে। এসব দেখে শত্রুরা চলে যায়, আর হযরত আবুবকর (রাঃ)সহ নবীজি আল্লাহ্‌র রহমে বেঁচে যান।"

কথা বলতে বলতে সবাই উঁচু পাহাড়টাতে উঠতে থাকেন। হঠাৎ কাছের অস্থায়ী দোকান থেকে একটি বারো, তের বছরের ছেলে ছুটে এসে রফিক ও আম্মার পথ রোধ করে বলল, "কেফ্! কেফ্! থামুন-থামুন!" হাত-পা নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করে তাদের পাহাড়ে উঠতে মানা করে। নিজে সামান্য একট উঠে, ইচ্ছে করে গড়িয়ে পড়ে গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে চোখ বুঝে, জিব বের করে মরে যাবার অভিনয় করে।

আম্মা ও রফিক পাহাড়ে উঠতে আর সাহস পেলেন না। দেখলেন, বাস্তবিকই পাহাড়টি বেশ খাড়া। আব্বা সাফা ভাইকে সাথে নিয়ে গুহার কাছে গেলেন। নিচে ফিরে এসে জানালেন যে, পাহাড়ে উঠতে ও নামতে বেশ কষ্ট হ'য়েছে। নিচে নেমে সবাই সেই ছেলেটির ভাইয়ের দোকান থেকে ক্যানে রাখা ফলের রস কিনে খেলেন। রফিক এ ক'দিনে লক্ষ্য করেছে যে এখানে ছোট বড় সবাই যথেষ্ট ফলের রস খায়।

www.amarboi.org

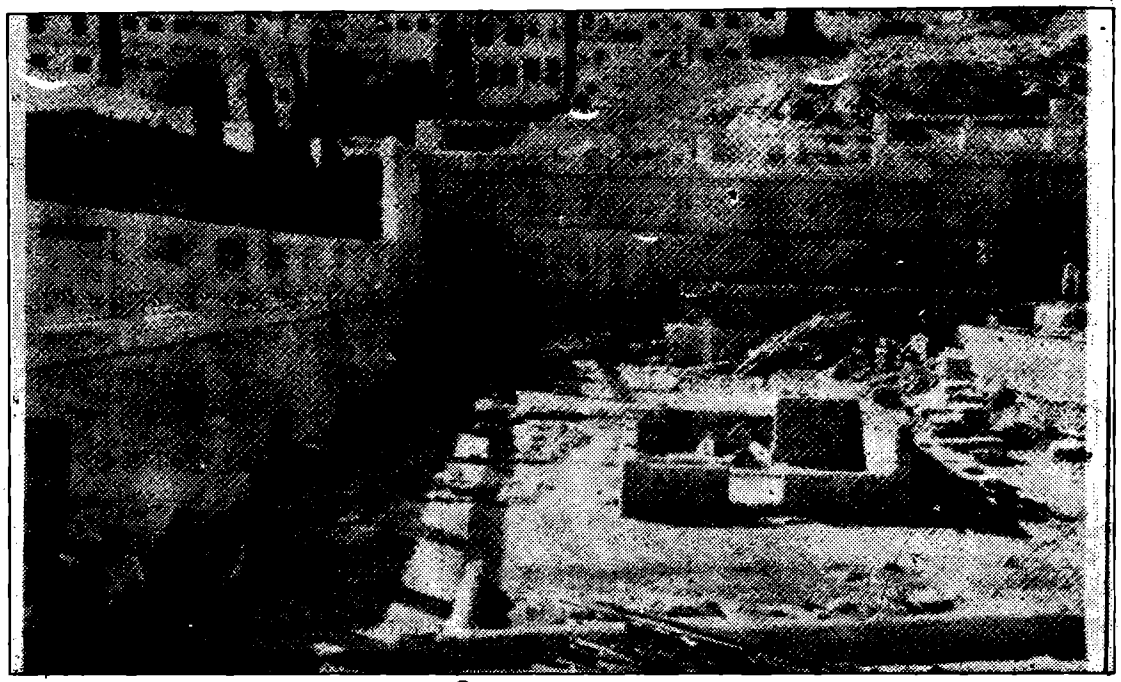

মক্কার প্রাচীন কবরস্থান জান্নাতুল মা'আলা

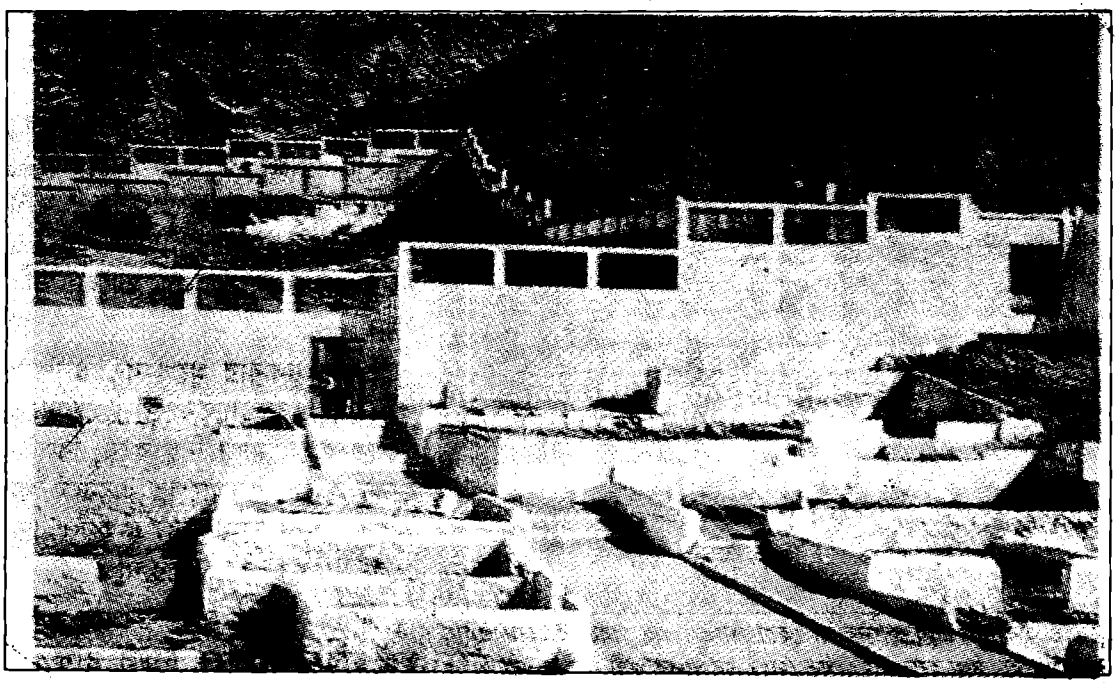

মক্কার কবরস্থান জান্নাতুল মা'আলা

www.amarboi.org

হেরা গুহায়

মাইল খানেক দূরে এসে, একটি পাহাড়ের নিচে, রাস্তার ধারে সাফা ভাই গাড়ি রাখল। বলল, "এই সেই পাহাড়, যার মধ্যে হেরা গুহা অবস্থিত। বর্তমানে একে বলে জাবালে নূর।

আম্মা রফিকের হাত ধরলেন। বললেন, "এই পাহাড়ের গুহাতেই নবী করিম (সঃ) আল্লাহ্‌র ধ্যানে রত থাকতেন। এখানে তাঁর ওপর প্রথম আল্লাহ্‌র ওহী বা নির্দেশ নাযেল হয়।"

"কিভাবে আম্মা?"

"একদিন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, এমন সময় ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) এসে তাঁকে বললেন, 'ইক্‌রা বিস্‌মি রাব্বিকাল্লাজি খালাক্‌! অর্থাৎ তোমার প্রভু যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নামে পড়!' মুহাম্মদ (সঃ) জবাব দিলেন, 'আমি তো পড়তে পারি না!' জিবরাঈল (আঃ) বললেন, 'আমার সঙ্গে পড়।' এভাবে হযরত (সঃ) নবুওত পেলেন মানে নবী হলেন। আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল বলে পরিচিত হলেন।"

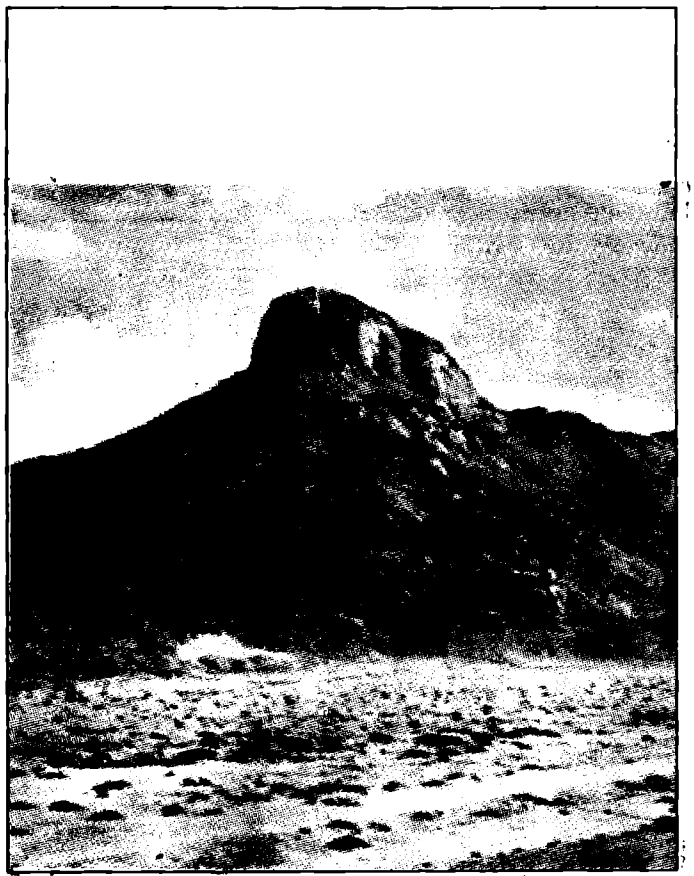

মক্কায় অবস্থিত জাবালে নূর বা হেরা পর্বত। এই পর্বতের হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ওপর ওহী নাযিল হয়েছিল

জাবালে নূর অনেক উঁচু হলেও খাড়া নয়। আগে কী রকম ছিল, জানে না ওরা। বর্তমানে বড় বড় চ্যাপটা পাথর অনেকটা সিঁড়ির মতো করে রাখা হ'য়েছে। কিংবা লোকজনের ওপর-নিচ ওঠা-নামার ফলে ওরকম সিঁড়ির মতো হ'য়ে গেছে।

রফিক, আব্বা, আম্মা ও সাফা ভাইয়া জায়গায় জায়গায় থেমে, বিশ্রাম নিয়ে যখন একদম গুহার কাছে চলে এলেন, তখন তাদের মনের মধ্যে অদ্ভুত এক ভাবের সৃষ্টি হয়।

গুহায় ঢুকবার মুখে বড় চ্যাপটা পাথর। এবড়োথেবড়ো। ভেতরে ঢুকতে হ'লে মাথা নিচু করে, কিছুটা বাঁকা হ'য়ে, দেয়ালের একদম গা ঘেঁসে দু'জন করে ঢুকতে হয়। এর বেশি লোক ভেতরে ধরে না।

প্রথমে আব্বা-আম্মা ও পরে সাফা ভাইয়ার হাত ধরে ঢুকল রফিক।

www.amarboi.org

ছোট বলে রফিকের মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়নি।

রফিক অবাক হ'য়ে দেখতে থাকে, এই উঁচু পাহাড়ে কত কষ্ট করে তাদের নবী করিম (সঃ) এখানে উঠতেন! উঠে আল্লাহ্‌র নাম করতেন।

ওরা সবাই এখানে নফল নামায পড়ে নিল।

একদম নিচে নেমে রফিক কিছু মাটি তুলে রুমালে বেঁধে, তার কাঁধে ঝোলানো ছোট্ট ব্যাগটাতে রেখে দিল। মোটা দানা দানা বালু। কাঁকর মেশানো মাটি। আমাদের দেশের মাটি বা বালুর মতো নয়।

গারে হেরার স্মৃতি চিহ্ন। দেশে ফিরে সবাইকে দেখাবে। তারা নিশ্চয়ই খুশি হবে।

হেরা গুহার পাদদেশে বেশ কয়েকটা অস্থায়ী দোকান রয়েছে। রফিকরা সবাই খুব শ্রান্ত। দোকান থেকে সেভেন আপ্, পেপসিকোলা, আপেল ও বড় বড় খেজুর কিনে খেল সবাই।

তারপর চলল মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফার পথে।

মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় কিছুক্ষণ

হেরা গুহা থেকে এবার মিনার পথে।

মক্কা শরীফ থেকে মাইল তিনেক দূরে পাহাড় ঘেরা কংকরময় বিরাট এক মাঠ। প্রায় জনমানব শূন্য। জায়গাটার নাম মিনা। ভাড়া দেবার জন্য কিছু দালান কোঠা ও বাদশার গেষ্ট হাউস রয়েছে। হজ্বের সময় এই মাঠে অজস্র তাঁবু খাটানো হয়। বিভিন্ন দেশের জন্য আলাদা আলাদা তাঁবুতে ভরে যায় মিনার প্রান্তর। প্রত্যেক দেশের সামনে তাদের নিজেদের দেশের নিশান ওড়ে।

"আব্বু, তুমি না বলেছিলে সামনের বছর আমরা হজ্ব করব! তখন ঐ তাঁবুতে থাকব, তাই না? কবে আব্বু?"

"ইনশাআল্লাহ্ সামনের বছর আমরা এখানে আসব। ৮ই যিলহজ্জ তারিখে এখানে এসে থাকতে হবে। তার পরের দিন ৯ই যিলহজ্ব তারিখে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত আরাফাত ও মুযদালিফায় কাটিয়ে ফের এখানে এসে ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকতে হবে, বুঝলে?

"খুব মজা হবে!" কল্পনায় রফিক বিশাল তাঁবুর রাজ্যটি ঘুরে আসে।

"না ভাইয়া" বলে সাফা, "মজার হলে কী হবে! খুব সাবধানে কিন্তু নিজ নিজ তাঁবুতে থাকতে হয়। সব তাঁবু এক রকম কিনা! আর হজ্বের সময় এত ভিড় হয় যে, অনেকে হারিয়েও যায়।"
"অমা! তাহলে?"

"ভয় নেই, হারিয়ে গিয়ে কষ্ট পেলেও, শেষ পর্যন্ত অবশ্য সউদি পুলিশের সাহায্যে ঠিক জায়গায় এসে পৌছানো যায়। আর জান, হজ্বের কয়েকটি ওয়াজিবের মধ্যে দু'টির জায়গা এখানেই। সে দু'টি হ'ল শয়তানকে কাঁকর ছুড়ে মারার তিনটি স্তম্ভ বা জোমরা ও প্রথম কোরবানি দেওয়ার স্থান।"

"এখানেই কোরবানি দেয়া হয়েছিল, একথা বুঝলাম। কিন্তু জোম্‌রা, শয়তানকে কাঁকর ছুড়ে মারা

www.amarboi.org

এসব কথার মানে তো কিছুই বুঝতে পারছি না সাফা ভাই!"

"বুঝিয়ে বলছি, শোন! বিবি হাজেরার শিশুপুত্র হযরত ইসমাঈলের (আঃ) কথা মনে আছে তো? তাঁর বয়স যখন বারো-তের বছর তখন আব্বা হযরত ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তাঁর মিলন হয়। একদিন রাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্ন দেখলেন– আল্লাহ্ তাঁকে বলছেন, "তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কোরবানি কর।"

তিনি একশ' উট কোরবানি দিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাতে আবার সেই একই রকম স্বপ্ন দেখলেন। এবার দিলেন দু'শ উট। তাতেও কিছু হ'ল না। তৃতীয় রাতের খা'বেও সেই একই আদেশ! বুঝতে পারলেন, আল্লাহ্ কী চান। ইসমাঈল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ধন। তাকেই কোরবানি দিতে হবে! কথাটা শুনে ইসমাঈল (আঃ) বললেন, 'আব্বা, আল্লাহ্র হুকুম পালন করুন!"

বাপ-ছেলে মিনার দিকে রওয়ানা হলেন। পথে শয়তান ইসমাঈলকে তিন তিনটি জায়গাতে কুমন্ত্রণা দিতে চেষ্টা করে। এতে হযরত ইবরাহীম তাঁকে বললেন, "শয়তানকে পাথর মেরে তাড়িয়ে দাও।"

হযরত ইসমাঈল (আঃ) শয়তানের উদ্দেশ্যে সাতবার পাথর ছুড়ে মারলেন। সেই থেকে ঐ তিনটি জায়গায় জোম্রা মানে স্তম্ভ তৈরি করা হ'ল। সেসব জোম্রায় পাথর মারা হাজিদের জন্য ওয়াজিব।"

"আচ্ছা সাফা ভাইয়া, ছোট ইসমাঈলকে কি তার আব্বা শেষ পর্যন্ত কোরবানি করেছিলেন?" রফিকের চোখ দুটো ছলছল করছে।

"হ্যাঁ, কোরবানিই করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু যেই না সে উদ্দেশ্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছেলের গলায় ছুরি চালাতে যাবেন, অমনি ফেরেশতা জিবরাঈল (আঃ) এসে হাজির হলেন। বলেন, "থাম! আল্লাহ্তায়ালা তোমার ও তোমার ছেলের ত্যাগ স্বীকার করা দেখে অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। ইসমাঈলের বদলে এই দুম্বাটা কোরবানি কর।" তাঁরা তাকিয়ে দেখেন ফেরেশমা জিবরাঈলের পাশে একটা দুম্বা। আল্লাহ্র আদেশে সেই দুম্বা কোরবানি করা হ'ল। মুসলিম জগতে প্রচলিত হল কোরবানি। আর কোরবানির রক্ত বয়ে যায় বলে এ স্থানের নাম হল মিনা। মিনা অর্থ প্রবাহিত।

কিছুক্ষণ মিনায় কাটিয়ে সবাই গাড়িতে উঠল। পাকা, ঝকঝকে প্রশস্ত রাস্তা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা আরেকটি বিস্তীর্ণ শূন্য এক মাঠে এসে পৌছল। আরাফাতের ময়দান। মক্কা-শরীফ থেকে ন'দশ মাইল দূরে।

রফিক এ জায়গাটির সম্বন্ধে কত কথাই না শুনেছে! আদি বাবা-মা আদম-হাওয়া বেহেশ্ত্ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে, বহু বছর আলাদা থাকার পর এখানেই আবার দু'জনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। আল্লাহ্ তাঁদের তওবা কবুল করেছিলেন।

৯ই যিলহজ্জ তারিখে এখানেই জোহরের পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত 'ওকুফ' করা অর্থাৎ অবস্থান করা হজ্বের তিনটি ফরজের একটি। ঐ সময়ে জোহরের ওয়াক্তে জোহর ও আছরের নামায একত্রে পড়তে হয়। এ হ'ল শরিয়তের হুকুম।

আরাফাতের ময়দানে অনেকেই তাঁবুতে বসে আল্লাহ্র এবাদত করেন। সাফা ভাইয়ার বর্ণনা

www.amarboi.org

মতে, "দূর থেকে সে সময় তাঁবুগুলোকে ঠিক মোম দিয়ে তৈরি খেলনা তাঁবুর মতো দেখায়।"

অদূরে একটা মসজিদ দেখা গেল। মসজিদে নিমের। হজ্বের সময় এখানে খুৎবা পাঠ করা হয়। বাদশা বা তাঁর কোন প্রতিনিধি তা পাঠ করেন।

আরাফাতের ময়দানে একদিকে একটি পাহাড়ের কাছে, ওরা গাড়ি থেকে নামল।

পাহাড়ের উপরের অংশটি সমতল। রফিক অতি সহজেই উপরে উঠে এল। পাহাড়টি এমনিতেই খুব বেশি উঁচু নয়, তারওপর তৈরি পাকা সিঁড়িও রয়েছে। নাম জাব্‌লুর রহমত। ওপরে উঠবার সময় ওদের কানে অত্যন্ত সুমধুর একটি গীতের সুর ভেসে আসে। সুরের রেশ পাহাড়টিকে মুখরিত করে, তার চারপাশেও তা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

গীতের ছত্রে ছত্রে আদম-হাওয়া (আঃ) এর নাম।

সাফা বুঝিয়ে দিল আদি পিতা-মাতার কাহিনী নিয়ে লোকটি গীত গাইছে। সুললিত কণ্ঠের সে আরবি গীত তাদের সবার মনে দোলা দেয়।

ওরা এখন জাব্‌লুর রহমতের ওপরে উঠে এসেছে।

পাহাড়ের পাদদেশের একদিকে একটি সাদা উঁচু স্তম্ভ দেখিয়ে সাফা ভাই বলল, "ওই যে সাদা নিশানাটি দেখছ, ওখানে 'কামওয়া' নামক এক উটের পিঠে বসে নবী করিম (সঃ) তাঁর বিদায় হজ্বের ভাষণ দিয়েছিলেন।"

"এখানে নবী করিম শেষ কী কথা বলেছিলেন আব্বু?"

"বলেছিলেন, সব মুসলমান সমান, কেউ বড়, কেউ ছোট নয়। আল্লাহ্‌র সাথে কারো শরিক করবে না। মিথ্যা কথা বলবে না। অতীতের সংস্কার, অনাচার ও সুদ গ্রহণ বাতিল করা হল। জেনো, নারী পুরুষের একের ওপর অন্যের সমান অধিকার রয়েছে। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি কোর না। দেশের যোগ্য নেতাকে মেনে চলবে। দাস-দাসীর প্রতি ভাল ব্যবহার করবে। কোন রকম অত্যাচার করবে না। আমরা যা খাই, পরি, তাদেরও তেমনি দিতে হবে।"

বলতে বলতে একটু থামলেন আব্বা। একটু কেশে বললেন, "পুতুল পূজা করা, বংশ-গৌরব করা, নিজ বংশকে ছোট মনে করে অন্য উচ্চ বংশের পরিচয় দেয়া, খুনোখুনি করা এ সবই মহাপাপ।" সবশেষে বলেছিলেন, "তোমাদের জন্য মহা সম্পদ গচ্ছিত রইল। সেগুলো হ'ল– কুরআন ও হাদিস।"

রফিক সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে দেখতে পেল, নিচের সমতল জায়গাটাতে কয়েকজন উট বাহক ভ্রমণকারীদের উটের পিঠে চড়িয়ে কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে নিয়ে রোজগার করছে।

রফিকের ভীষণ শখ হ'ল উটের পিঠে চড়বে।

পাঁচ রিয়াল দিয়ে রফিক উটের পিঠে সওয়ারি হ'ল।

ক্লিক্! ক্লিক্! সাফা ভাইয়া রফিকের দুটো ফটো তুলে নিল।

এরপর ওরা এল মুযদালিফায়। এও আরেক বিরাট ময়দান। ৯ই যিলহজ্জের দিনের পর রাতে এই খোলা ময়দানে আসমানের নিচে মাটিতেই হাজিরা সারারাত আল্লাহ্‌র এবাদত করে কাটান। মাগরিব

www.amarboi.org

ও এশার নামায এখানেই একসাথে পড়তে হয়। হজ্বের সময় এখান থেকে ফেরার পথে 'জোমরা'তে শয়তানকে যে কাঁকর ছুড়ে মারার নিয়ম আছে সেই ছোট ছোট কাঁকর এখান থেকেই হাজিরা কুড়িয়ে নেন।

সামনে দাঁড়িয়ে একটা পাহাড়। "এটির নাম মাশ্আরিল হারাম। এর ওপর একটি মসজিদ আছে। চলুন, জোহরের নামাযটা আমরা ওখানে গিয়েই পড়ি।"

সাফা-ভাইয়ের কথামতো সবাই সেখানে নামায পড়ে নিল। এরপর ফের গাড়িতে। মাশ্আরিল হারামের পশ্চিম দিকে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' হাত দীর্ঘ একটি ময়দানের কাছে সাফা-ভাই গাড়ি থামাল। তার সামনের সীমানাটা একটু নিচুতে অবস্থিত। নাম মহাস্সর। আম্মা সবাইকে এখানে খানা পরিবেশন করলেন।

তৃপ্তির সাথে খেতে খেতে সাফা-ভাই বলল,

"জানো ভাইয়া, এ আমরা কোন্ জায়গার কাছে বসে আছি?"

'ভাইয়া' কেন, তার আব্বা-আম্মাও তা জানেন না।

সাফা আঙুল দিয়ে একটা সীমানা দেখাল।

"ওই দেখুন, ওখানেই মুযদালিফা ময়দানের শেষ সীমা। এ সীমানার বাইরে ওই সাড়ে পাঁচশ' হাত লম্বা নিচু জায়গাটাতে গযবের স্থান বলে ধরা হয়। এজন্য হজ্বের সময় হাজিরা খুব তাড়াতাড়ি এ জায়গাটা পার হয়ে যান।"

আম্মাকে মনে হ'ল হঠাৎ যেন একটু ভয় পেয়ে গেছেন। "হায় আল্লাহ্, এই সেই গযবের জায়গা নাকি?"

"ঘটনাটা আমাকে বল না আম্মা!" রফিকের ভয় মেশানো কণ্ঠে কৌতূহল উপছে উঠছে।

"বলছি, আগে খাওয়া দাওয়া শেষ হোক্।"

খাওয়া শেষে থালাবাসন গুছিয়ে রেখে শুরু করলেন আম্মা,

"আমাদের প্রিয় নবীজি (সঃ) যে বছর জন্মেছিলেন, সেই ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সে সময়েই ঘটেছিল আশ্চর্যজনক এই ঘটনা। সউদি আরবের পাশে ইয়ামেন বলে একটা দেশ আছে। সেই দেশটি তখন খ্রীষ্টানদের দখলে। ইয়ামেনের শাসকের নাম ছিল আবরাহা আশরাম। ভীষণ অহংকারী আর পাজি ছিল সে। আল্লাহ্তায়ালার ওপর বিশ্বাস আনা তো দূরের কথা, সে করল কী, কাবাশরীফ ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা দিল। তার সাথে ছিল বিরাট এক সৈন্য বাহিনী ও অনেকগুলো হাতি। মক্কাবাসীদের তখন এমন কোন সৈন্য সামন্ত বা অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না যা দিয়ে আবরাহার ঐ বাহিনীকে বাধা দিতে পারে। কোরাইশদের পক্ষ থেকে রাসূলে করিমের (সঃ) দাদা আব্দুল মোত্তালেব কাবাঘরের দরজায় ঝুঁকে পড়ে আল্লাহ্র কাছে নিবেদন করলেন, "হে পরওয়ারদেগার, কাফেরদের হাত থেকে তুমি কাবাশরীফ রক্ষা কর!"

ওদিকে আবরাহা তার হাতি ও সৈন্যসামন্ত নিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে আসছে। হায় আল্লাহ্! পবিত্র কাবাঘরকে বুঝি কেউ আর রক্ষা করতে পারল না।!

www.amarboi.org

হঠাৎ সারাটা আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল। আবরাহার বুক কেঁপে উঠল। মেঘ নয়, অসংখ্য পাখি। ক্ষুদে ক্ষুদে সব আবাবিল পাখি। প্রত্যেকের ঠোঁটে একটা করে ছোট্ট নুড়ি। পাখিরা আবরাহা ও তার হাতি এবং সৈন্যসামন্তদের ওপর নুড়িগুলো তীরের মতো ছুড়ে মারতে লাগল। ক্ষত-বিক্ষত হয়ে সবাই প্রাণ হারাল। সেদিন এ জায়গাটা– এই আমরা যে জায়গার কাছাকাছি বসে আছি, সৈন্যদের তীব্র চিৎকার ও আর্তনাদে ভরে গিয়েছিল।"

সব শুনে রফিকের গাটা ছমছম করে ওঠে। বলে,

"চল আম্মা, সাফা ভাইয়া, বাড়ি যাই। আর এখানে বসব না।"

"হ্যাঁ চল।"

যাবার জন্য সবাই উঠে দাঁড়ায়।

ভিখারির খোঁজে

দেখতে দেখতে মক্কায় বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল।

রফিক তাদের বাসা থেকে বাজার পর্যন্ত পথে বেশ কয়েকবার যাতায়াত করেছে। আশ্চর্য! একটা ভিখারিও নজরে পড়েনি।

আজ শুক্রবার– ইয়াওমুল জুমা। ভেবেছিল বাজারে এসে, বিশেষ এদিনটিতে হয়তবা কারো দেখা পাওয়া যেতেও পারে। কিন্তু না কোন ফকির টকির দেখাই গেল না।

বাজারে এসে আম্মা তরকারি, ফল ও পরে লাহামুদ্ দুজাজে মানে মুরগির গোস্ত কিনে ব্যাগ বোঝাই করে ফেলেছেন। পাশে একটা কাঁচা বাজার। আম্মা এখানেও কিছু কিনলেন। বাযেনজান, যাহ্‌রা, বানাদুরা ও খেয়ার অর্থাৎ বেগুন, ফুলকপি, টমেটো ও শসা।

রফিক এখানে এসে ছেঁড়া-নোংরা জামা-কাপড় পরা ছেলে-মেয়ে কোনদিন দেখেনি। ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া আধাপচা ফলমূল আর তরকারি কুড়িয়ে নিয়ে ঝোলা ভরছে, এরকম দৃশ্য তো ভুলেও চোখে পড়েনি। ফেরার পথে রফিক তার বুক পকেটে হাত বুলাল। আট রিয়াল আছে। টাকাটা যে আরবদেশী কোন গরিবকে দিতেই হবে। মাক্কায় রওয়ানা দেবার আগে তার অতি প্রিয় দাদি তাকে বলে দিয়েছেন "আমার হ'য়ে কিছু টাকা ওখানকার ফকির মিস্‌কিনকে দান করে দিস্।"

দাদি খুশি হবেন, আর রাসূলের (সঃ) দেশের ফকিরের দু'আয় তিনি ভাল হয়ে যাবেন, এইসব ভেবে রফিক মক্কায় আসবার পর থেকেই ভিখারি খুঁজছে।

নামাজের সময় হয়েছে। হেরেম শরীফ থেকে আযানের মিষ্টি সুর ভেসে আসছে। মসজিদের একটা দরজা দিয়ে ঢুকবার সময় দেখে আরে! কী অবাক কাণ্ড! গেটের কাছে এক বোরকা পরা ভিখারিনী, কুচকুচে কালো। রফিক বুঝতে পারে ভিখারিনীটা এদেশের না। এদেশের সবাই ফরসা ও সুন্দর।

নামাযীরা অনেকেই তাকে দু'চার রিয়াল করে দিয়ে দিচ্ছেন। রফিক এখানে এই প্রথম একটি ভিখারি দেখল, কিন্তু তার সাজসজ্জা দেখে অবাক! বোরকাটা নতুন এবং সিল্কের। বোরকার নিচে ম্যাক্সির যে অংশটা দেখা যাচ্ছে সেটাও বেশ দামি এবং লেস লাগানো।

www.amarboi.org

যাহোক ভিখারি যখন একটা পাওয়াই গেছে, দাদির হয়ে দু'চার রিয়াল ওকেই দিয়ে দেবে।

আব্বা-আম্মাকে এ বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়ার আগেই রফিক দেখল, ভিখারিনীটা খরগোসের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে সেখান থেকে উধাও।

কী ব্যাপার?

পেছনে তাকিয়ে দেখে এক সউদি পুলিশ শক্ত একটা ছড়ি হাতে এদিকে আসছে।

অ, এজন্যই?

আব্বা-আম্মাও শৌখিন ভিখারিনীটার কাণ্ড-কারখানা দেখছিলেন।

হাসলেন আব্বা, "দেখেছ রফিক! সাফা বলছিল, শক্ত-সমর্থ লোকদের এখানে ভিক্ষে করতে দেওয়া হয় না! অন্য দেশী এই মেয়েলোকটা লুকিয়ে ভিক্ষে করছিল। পুলিশ দেখে দিব্যি হাওয়া হয়ে গেছে!"

ভাগ্যিস, অলস ও অকর্মণ্য এই মেয়ে লোকটাকে তার ভিক্ষে দিতে হল না! মনে মনে খুশি হ'ল রফিক।

হেরেম শরীফের ভেতরে ঢুকে তারা জমজমের কূয়োর কাছে এল। কী অবাক কাণ্ড! কূয়োর কাছে আজ রীতিমত একজোড়া ভিক্ষুক! একজন অন্ধ, অপরজনের দুটো হাতই নেই। বোঝা গেলো ওরা পুলিশের অনুমতি নিয়েই ভেতরে ঢুকেছে।

দু'জনের কাছে এসে রফিক চার চার রিয়েল করে দিয়ে দিল। মনে মনে বলল, "তোমরা দাদির হয়ে টাকাটা নাও, আর দু'আ কর দাদি যেন খুব শীগগির ভাল হয়ে যান।"

বলেই কিন্তু রফিক চুপসে যায়। দাদি না টাকা দিতে বলেছিলেন মক্কার কোন লোককে! খেয়াল হল, অন্ধটি খুব কালো, চুল ঘন ও বেশি রকম কোঁকড়ানো। আর যার দু'হাত নেই, সে দেখতে অনেকটা বাংলাদেশী লোকদের মতো।

দাদির মনের ইচ্ছাটা শেষ পর্যন্ত পুরা করা হ'ল না। আরো কয়েক দিন মক্কায় থেকে বুঝল রফিক তা হবারও নয়। কেননা খাস এদেশের লোকেরা কেউই ভিক্ষে করে না। সে দাদিকে এ চমৎকার খবরটা জানিয়ে লম্বা একটা চিঠি লিখল। এখানে ভিক্ষুক যে নেই, একথা জানতে পারলে দাদি মন খারাপ না করে নিশ্চয় খুশিই হবেন।

চিঠিটা খামে বন্ধ করতে করতে রফিক অনেক কথা ভাবল। আজ হেরেম শরীফে মাগরিবের নামাজ পড়ে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ চাইব– আমাদের দেশের লোক যেন এত গরিব না থাকে, ফকির না হয়!

... নামায পড়ে রফিক কিছুক্ষণের জন্য খুব খুশিতে বিভোর হয়ে রইল।

... আমাদের দেশেও তো এমনি হতে পারে! কেন হবে না? এখানে যদি হয়, তবে ওখানে হবে না কেন? ওহ্! কী চমৎকার হবে যদি ঢাকার পথে-ঘাটে, বাজারে, স্টেশনে, দোকান বা কোন বাড়ির সামনে একটা ভিখারিও না দেখা যায়! আর .....

এবার ফিক করে আপন মনে হেসেই ফেলল রফিক! আর খুবই মজা হবে যদি তারই মত এদেশের একটি ছেলে বাংলাদেশে গিয়ে ভিখারি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে পড়ে।

www.amarboi.org

নীল আকাশের বুকে

হেরেম শরীফে নামাজ পড়তে যাবার পথে রফিকের রোজই নজরে পড়ে উঁচু ওই খাড়া পাহাড়টা। ওহ্! কত্তো উঁচুতে ওই জাবালে আবু কোবায়েস বা আবু কোবায়েস পাহাড়! আর একেবারে তার চূড়ায় রয়েছে হযরত বেলালের (রাঃ) ওই মসজিদটি! ছোট্ট মসজিদ। ধবধবে সাদা। পেছনে বিস্তৃত নীল আকাশ। মনে হয়, যেন আকাশ থেকে নেমে এসে আল্‌তোভাবে মাটি ছুঁয়ে আছে।

রফিক তার আব্বা-আম্মা ও আলীম চাচার সাথে হযরত বেলালের (রাঃ) মস্‌জিদটি দেখতে যাচ্ছে।

মস্‌জিদুল হারাম লাগোয়া সাফা পাহাড়ের ঠিক উল্‌টো দিকে এই আবু কোবায়েস পাহাড় অবস্থিত। আলীম চাচা জানালেন, অনেক বছর আগে সাফা ও আবু-কোবায়েস দুটো পাহাড় এক সাথে লাগা ছিল। পরে ডিনামাইটের সাহায্যে দু'পাহাড়ের মধ্যের পাথর ভেঙে চওড়া পাকা সড়ক তৈরি করা হ'য়েছে। পাথর-কাটা খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে রয়েছে একতলা, দোতলা, বহুতলা বিশিষ্ট বাড়ি। দোকান ও কিছু সমতল জমিও আছে। ঘর-বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে কিছু-কিছু নিম ও বাবলাজাতীয় গাছ দেখা যায়।

সদর রাস্তা ছেড়ে, সামান্য একটু মোড় ঘুরে জাবালে আবু কোবায়েসের পথ ধরেছে ওরা।

কিছুটা পাকা রাস্তা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে। তারপরেই শুরু হয়েছে সিঁড়ির রাস্তা। গাড়ি চলার অনুপযুক্ত।

"সিঁড়ির রাস্তা! কী মজা! না আম্মু?"

"হ্যাঁ, উঠতে কষ্ট হ'লেও, মজার বৈকি!"

কয়েকটা বাড়ির সদর দরজার সামনে দিয়ে, কয়েকটা ঘরের পেছনে দুয়ারের কাছ ঘেঁসে ওরা এবার কিছুটা খাড়া পাথরের পথ ধরেছে। রফিক চাচার হাত ধরে ওই খাড়া পথটা পার হ'য়ে এল। সিঁড়ি ডিঙিয়ে ও খাড়া পথ ধরে চলতে গিয়ে সবাই হয়রান। একটা সিঁড়িতে বসল। লোক চলাচল খুবই কম। নীরব। নির্জন। চাচা মসজিদের দিকে ঘুরে বসলেন।

"অনেক কারণে কিন্তু এ পাহাড়টা নাম করা।"

"কী কী কারণ চাচা?"

"আল্লাহ্‌র আদেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই পাহাড়ে উঠেই পৃথিবীর লোকদের হজ্ব করবার জন্য ডেকেছিলেন।"

"অ, তারপর?"

"লোকেরা বলে, বিখ্যাত পীর আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) এখানেই থাকতেন। আর এখানেই তৈরি হল হযরত বেলালের নামে এই মসজিদ।"

..... বেশ কয়েক ধাপ পার হ'য়ে তারা একটা ছোট সমতল জায়গায় এলো। ফরসা সুন্দর চারজন ছেলেমেয়ে খেলা করছে। ছেলেরা তোফ আর মেয়েরা পরেছে রঙিন ম্যাক্সি। ওদের দেখে

www.amarboi.org

তারা খেলা বন্ধ করল। সবার দৃষ্টি রফিকের দিকে। রফিক সম্বন্ধে ওরা নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছে আর খুশি খুশি চোখে ওর দিকে তাকাচ্ছে।

"মা ইস্‌মুকা? তোমার নাম কি?"

আলীম চাচার প্রশ্নে মিষ্টি হেসে জবাব দেয় ওদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছেলেটি।

"ইস্‌মি আবদুল্লাহ্।"

পাশের মেয়ে দুটোর দিকে তাকাতেই তারা চটপট জবাব দেয়, "আনা খাদিজা।"

"আনা ফাতিমা।"

ওদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট খোকনটির ক্ষুদে ক্ষুদে দাঁতও বেরিয়ে পড়ে। শোনা যায় তার আধো আধো কণ্ঠস্বর "ইস্‌মি হামযা।"

আম্মা হামযাকে কোলে তুলে নেন।

"সবার নামই দেখছি নবীজির আত্মীয়-স্বজনের নামে রাখা!"

"ঠিক ধরেছেন ভাবি! আমিও এ্যাদ্দিন ধরে লক্ষ্য করেছি, এখানকার অধিকাংশ লোকই এ ধরনের নাম রেখে থাকে।"

চটপটে ছেলে আবদুল্লাহ্। প্রশ্ন করে,

"মিন আয়্যে বেলাদিন্ আন্‌তুম্? –আপনারা কোন্ দেশের লোক?"

"নাহনু মিন বাংলাদেশ। –আমরা বাংলাদেশের লোক।"

"বাংলাদেশ, বাংলাদেশ!" কয়েকবার উচ্চারণ করে ওরা। এরপর রফিকের দিকে ফিরে তার নাম জানতে চায়। নাম শুনে ওরা হাততালি দিয়ে ওঠে, "রফিক, রফিক, বন্ধু! ভারি সুন্দর নাম!"

হামযা আম্মার কোল থেকে নেমে পড়েছে।

বিকেল সরে গিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। চারদিকে বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। দিনের মতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব।

ছেলেমেয়েদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ওরা ওপরে উঠতে থাকে। নির্জন এক জায়গায় বেশ কয়েকটা দুম্বা বসে আছে। সাড়া পেয়ে দুম্বাগুলো উঠে দাঁড়াল। বাতাসে একটা বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

সামনে চওড়া কয়েকটা সিঁড়ি। ঐ সিঁড়িগুলোর শেষ ধাপেই হযরত বেলালের (রাঃ) মসজিদ। বাঁ পাশে সরু খোলা একটা প্রবেশ পথ। সেখান দিয়ে সরাসরি ওরা মসজিদের উঠানে উঠে এল। দেখে উঠানের এক কোণে বসে একজন বুড়ো মেয়েমানুষ তসবীহ্ গুণছেন। আলীম চাচাকে আরবিতে কথা বলতে শুনে, বৃদ্ধার উচ্ছ্বাস আর ধরে না! কলকল করে কথা বলতে থাকেন। খুব কাছেই তাঁর বাসা, তবে মসজিদের উঠানের এই কোণটাতেই তিনি বেশির ভাগ সময় পড়ে থাকেন। ..... এখানে এই পাহাড়ে যাদের ঘর, তারা ছাড়া, কেউ বড় একটা এদিকে আসে না।"

মসজিদের দরজায় প্রকাণ্ড এক তালা ঝুলছে। বৃদ্ধা জানালেন যে, "মাত্র কিছুক্ষণ আগেই মসজিদের তালা বন্ধ করা হ'য়েছে। এশার আযানের আগে আবার তা খোলা হবে।"

www.amarboi.org

দরজাটা একটু ফাঁক। ভেতরটা দেখা যাচ্ছে। সারা ঘর জুড়ে সাধারণ কার্পেট বিছানো রয়েছে। পাশে কাঠের তাক ও আলমারি। তাকের ওপর সাজানো কুরআনশরীফ।

ওঁরা দেখেন আর ভাবেন– কী সাধারণ এই মসজিদ আর কী অসাধারণ তার ফজিলত!

দু'রাকাত করে নফল নামায পড়লেন সবাই। রফিকও।

নামায শেষে মসজিদের উঠানের এক কোণে দাঁড়িয়ে ওঁরা দেখেন নিচের আলো ঝলমল মক্কা শহর।

সড়ক, দোকান-পাট, বাড়ি-ঘর অতুলনীয় হেরেম শরীফকে দক্ষ শিল্পীর আঁকা ভারি একটা সুন্দর ছবির মতো মনে হচ্ছে। লোকজনদের দেখাচ্ছে ছোট ছোট পুতুলের মতো।

"হযরত বেলাল কে ছিলেন আব্বু, যাঁর নামে এই এতো উঁচু পাহাড়ের ওপর মসজিদ বানানো হয়েছিল?"

"ওহ্ হো, তাই তো! বেলাল সম্বন্ধে তো কিছুই তোমাকে বলা হয়নি। তিনি ছিলেন ইথিওপিয়া অর্থাৎ আগে যাকে আবিসিনিয়া বলা হতো, সেখানকার লোক। তাঁর আব্বা-আম্মা তাঁকে আব আবদুল্লাহ্ বলে ডাকতেন। পরবর্তীকালে তিনি সুপরিচিত হয়েছিলেন হযরত বেলাল (রাঃ) নামে। তাঁর আব্বা ছিলেন রাবাহ্ ও আম্মা হামামা। সে চৌদ্দশ' বছরেরও আগের কথা। হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মাত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে শুরু করেছেন। সে সময়ে হযরত বেলালের আব্বা-আম্মাকে আবিসিনিয়ার দাস ব্যবসায়ীরা মক্কাবাসী কোন এক ধনী লোকের কাছে ক্রীতদাস রূপে অর্থাৎ কোন চাকর হিসেবে বিক্রি ক'রে দেয়। কাজেই শিশুকাল থেকেই বেলালকেও কেনা গোলাম হ'য়েই দিন কাটাতে হচ্ছিল।"

"অমা, হযরত বেলাল (রাঃ) চাকর ছিলেন! কেনা চাকর!!"

"হ্যাঁ, তবে আজকাল যেমনটি দেখ, তেমন না। ওই কেনা চাকরদের জীবন ছিল কুকুর, বেড়াল-পশুদের চেয়েও খারাপ। মনিবরা তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করাতো ও ভীষণ যন্ত্রণা দিত।"

"ইস, কী ভীষণ নিষ্ঠুর ছিল ওই মনিবগুলো!"

রফিকের মনটা খারাপ হ'য়ে যায়।

"হ্যাঁ, এমনি একজন ভয়ানক খারাপ ও নিষ্ঠুর লোক ছিল মক্কার এক দলপতি। নাম উমাইয়া বিন খাল্‌ফ। সে হযরত বেলালকে প্রথম কিনেছিল। ক্রীতদাস জীবনে এই উমাইয়ার কাছে হযরত বেলাল ভয়ানক নির্মম ব্যবহার ও অমানুষিক যন্ত্রণা পেয়েছিলেন। হযরত বেলাল আল্লাহ্‌র নাম জপ করতেন বলে উমাইয়া রেগে আগুন হতো। একদিন ক্রুদ্ধ উমাইয়া তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে, একটা অন্ধকার ঘরে ফেলে রাখল। এখানে বসেও বেলাল (রাঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার নাম নিতে থাকেন। সেজন্য উমাইয়ার আদেশে তাঁকে মক্কার শক্ত পাথরের পথে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হ'ল। ঐ একই কারণে একদিন দুপুরের মরুভূমির খুব গরম বালুর ওপর চিৎ করে শুইয়ে বুকের ওপর ভারি পাথর চাপা দেয়া হ'ল। হযরত বেলাল (রাঃ) জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। যখন সামান্য জ্ঞান ফিরে এল, তিনি শুনতে পেলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) উমাইয়ার কাছ থেকে বেশি টাকা দিয়ে তাকে কিনে

www.amarboi.org

নিয়েছেন। আল্লাহ্‌র মেহেরবানিতে হযরত বেলালের দুঃসহ যন্ত্রণার দিন শেষ হ'ল। আবুবকর (রাঃ) তাঁকে সুস্থ করে তুলে দিলেন নবী করিমের (সঃ) হাতে।" সবাই যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। হযরত বেলালের (রাঃ) দুঃখজনক ঘটনাগুলো জেনে সবার মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে গেল।

রফিক তার চাচার দিকে ফিরল।

"আচ্ছা চাচা, শুনেছি হযরত বেলাল নাকি সবচেয়ে প্রথমে আযান দিয়েছিলেন, এ মসজিদ থেকেই বুঝি?"

"না বেটা, এখান থেকে নয়। প্রথমে আযান দিয়েছিলেন তিনি মদিনার নবীজির তৈরি মসজিদে নববী থেকে। সে ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সে সময়ে জামাতে নামাজের জন্য নামাজিদের কিভাবে ডাকা যায়, এ নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত বেলালকে ঐ মসজিদে নববীতে প্রথম আযান দিয়ে নামাজিদের ডাকতে আদেশ দেন। হযরত বেলালই (রাঃ) হলেন প্রথম মুয়ায্‌যিন।"

"আচ্ছা চাচা, তাহলে এই মসজিদের নাম বেলালের মসজিদ হ'ল কেন?"

"তাহলে একটু আগে থেকেই বলি। তুমি তো জান রাসূলে করিম (সঃ) নিজ দেশ মক্কার লোকদের অত্যাচারে অস্থির হ'য়ে সেখান থেকে মদীনায় চলে এসেছিলেন। মদীনার লোকেরা তাঁকে খুব সমাদরে রেখেছিলেন, তাতো জানই। হ্যাঁ কী বলছিলাম, প্রায় দশ বছর পর একটা যুদ্ধে জয়লাভ করে নবীজি দশ হাজার সঙ্গী সাথী নিয়ে মক্কায় ফিরে এলেন। মক্কাবাসীরা আর তাঁকে বাধা দিতে পারল না। নিজেদের অন্যায়ের কথা ভেবে ভয়ে তাদের সে কী ছুটোছুটি। কিন্তু আমাদের রাসূল তো ছিলেন খুবই উদার ও ক্ষমাশীল! তিনি ঘোষণা করলেন, "লা তাছরীবা আলাইকুমুল্ ইয়াওম্" অর্থাৎ আজকে তোমাদের কোন ভয় নেই। আজ প্রতিশোধ নেবার দিন নয়, শুধু ক্ষমা আর ক্ষমার দিন।" তিনি আরো ঘোষণা করলেন, "যারা কাবাঘরে আশ্রয় নেবে তারা নিরাপদ এবং যারা অস্ত্র দূরে ফেলে হযরত বেলালের (রাঃ) কাছে এসে দাঁড়াবে, তারা আরো নিরাপদ।" নবী করিম (সঃ) একটা কাপড়ের নিশান বেলালের হাতে তুলে দিলেন। হযরত বেলাল (রাঃ) সেই নিশান নিয়ে এসে দাঁড়ালেন এই পাহাড়ের ওপর, যেখানে আজ এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। পরে বেলালের সম্মানের জন্যই এ মসজিদটি তাঁর নামে নির্মাণ করা হয় ও তাঁকে শুধু বেলাল না ডেকে, তখন থেকে ডাকা হয় হযরত বেলাল (রাঃ) নামে। একজন কাফরি ক্রীতদাসকে শুধু তাঁর নিজের গুণের জন্য এতটা মর্যাদা ও সম্মান দেয়া হ'য়েছিল।"

ফিরে যাবার সময় হ'য়েছে। বুড়ো মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়েই সবাই নিচে নামতে শুরু করেন।

সমতল জমিটাতে এসে রফিক অবাক হ'য়ে যায়! দেখে সেই আবদুল্লাহ্, খাদিজা, ফাতিমা ও হামযা একটা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে তারা অপেক্ষা করছে। হাসিমুখে এগিয়ে এল। কয়েকটা ছোট প্যাকেট তুলে দিল রফিকের হাতে। ঘরে যা ছিল, তাই এনে দিয়েছে। খেজুর, আপেল এবং হেরেম শরীফ ও মাকামে ইবরাহীমের দুটো সুন্দর ছবি।

www.amarboi.org

রফিক মাথা ঝুঁকিয়ে ধন্যবাদ জানালো– "শুকরান্!"

আলীম চাচার দিকে ফিরে আবদুল্লাহ্ অনুরোধ করল, রফিক যেন তাদের কথা মনে রাখে, আর একদিন যেন কষ্ট স্বীকার করে তাদের বাসায় মেহমান হ'য়ে আসে।

ওদের আন্তরিকতায় শুধু রফিক নয়, সবাই মুগ্ধ হয়। বইয়ে পড়া আরবদের আতিথেয়তার গল্পগুলো রফিকের মনে পড়ে যায়।

লেখাপড়ার মাঝে

আরবে রফিকের সময় গড়িয়ে যায়।

আব্বা যান অফিসে। আম্মা ঘর-সংসার, হাট-বাজার, রান্না-বান্নায় ব্যস্ত থেকেও রফিককে সকাল সন্ধ্যায় পড়াতে বসেন। অংক, ইংরেজি ও বাংলা। ঢাকা থেকে ক্লাস ফোরের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট এনে কিছু লাভ হ'ল না। এখানে বাংলাতো দূরের কথা, ইংরেজিরও কোন স্কুল নেই। সবকিছুই আরবিতে পড়তে হয়।

তাদের একজন পড়শি আছেন বাঙালি। তিনি এখানকার একজন শিক্ষক। নাম শেখ আবদুল মোত্তালিব। তাঁর সাথে তাদের পরিচয় ও পরে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। তিনি নিজ থেকেই মাঝে মাঝে রফিককে আরবি শেখাতে আসেন। প্রথমে শিখল কিছু সর্বনাম ঃ আমি-আনা, আমরা-নাহ্নু, আপনি (পুঃ) আন্তা, আপনি স্ত্রী (আন্তে), সে (পুঃ) হুয়া, সে (স্ত্রী) হিয়া, তারা (পুঃ) হুম, তারা (স্ত্রী) হুন্না, আমাকে-নি, আমাদিগকে-না, তোমাকে (পুঃ) কা, তোমাকে (স্ত্রী) কে, তাদের (পুঃ)-হুম, তাদের (স্ত্রী)-হুন্না, আমার (স্ত্রী ও পুঃ) লি, আমাদের (স্ত্রী)-লানা। আরো শিখল ঃ ইহা–হাযা (ওদেশীরা উচ্চারণ করে হাদা)। যে, যিনি, কে-মান্, কি-মা, মাযা, কেন-লেমা, কাকে- লেমান, কেমন-কায়ফা, আচ্ছা-খায়র্, না-লা; কত-কাম, কোথায়-আইনা।

মোত্তালিব চাচা'র কাছে আরো কিছুটা আরবি পড়লে, সে স্কুলে ভর্তি হতে পারবে।

কয়েক দিনের মধ্যে শিখল, মাথা-রা'সুন, চুল-শায়রুন, চোখ-আইনুন, নাক-আনফুন, কান-উযনুন, মুখ-ফামুন, দাঁত-সিন্নুন, হাত-আয়দুন, পা-রিজলুন।

সেদিন বসবার ঘরে মোত্তালিব চাচা ও আব্বা এখানকার পড়াশোনা সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। রফিক শুনছিল। মোত্তালিব চাচা বলছিলেন,

"বুঝলেন ভাই সাহেব, এদেশে আছে প্রচুর তেল, প্রচুর টাকা পয়সা। প্রাচুর্যের তুলনায় আগে শিক্ষাদীক্ষা খুব কমই ছিল।"

"এখানকার অবস্থা কি?"

"এখানকার অবস্থা অবশ্য দ্রুত উন্নতির দিকে। সউদি কর্তৃপক্ষ বেশ কয়েক বছর আগে থেকে সউদিদের শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট উৎসাহিত করছেন। ছাত্রদের সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য দিচ্ছেন। অসংখ্য বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় সব ছাত্রই এক বা একাধিক বৃত্তি পেয়ে থাকে।"

"আচ্ছা ভাই সাহেব, ক'বছর বয়সে ছাত্রেরা স্কুলে ভর্তি হতে পারে?"

www.amarboi.org

"ছ'বছর বয়সে। এর আগে কোন ছাত্রকে স্কুলে ভর্তি করা হয় না। ভর্তির সময় জন্মের সার্টিফিকেট অবশ্যই লাগবে।"

"শুনেছি এখানে সম্প্রতি ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি পড়াবার জন্যে বিদেশ থেকে ভাল ভাল শিক্ষক মোটা বেতনে আনা হয়েছে?"

"ঠিকই শুনেছেন আপনি। তবে সউদি কর্তৃপক্ষ খুবই চেষ্টা করছেন যা'তে অতি শীঘ্রই নিজেদেরই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও অন্যান্য পেশায় উপযুক্ত লোক তৈরি হয়ে যায়। আর বিদেশী শিক্ষক নিয়োগ করতে না হয়। ইতোমধ্যে তাদের বেশ কিছু লোক উপযুক্ততা অর্জনও করে ফেলেছেন। আগের সউদি আরবের সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষার সাথে বর্তমানের ঐসব ব্যবস্থার অনেক পার্থক্য।"

মোত্তালিব চাচা রফিকের মনোযোগ লক্ষ্য করে কাছে টেনে নিলেন।

"তুমিও জেনে রাখ বেটা। সউদিরা এখন বেশ উন্নতি করছে। আর এই উন্নতির পথকে সহজ করতে যে মানুষটি এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি কে জান? তিনি মরহুম বাদশা ফায়সাল।"

মোত্তালিব চাচা ফিরলেন আব্বার দিকে। "শুধু বাদশা ফায়সালই নন, শুনেছি তাঁর স্ত্রী রানি ইফাত আরাও শিক্ষা প্রসারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় শুধু যে সনাতন জীবন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে, তা নয়, নারী সমাজেরও বহু উন্নতি হয়েছে। সেই ১৯৬৪ সনে যখন বাদশা ফায়সাল ক্ষমতায় আসেন, তখন থেকেই রানির উৎসাহে তিনি সউদি মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে মক্কায় প্রথম একটি স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু বুঝতেই পারছেন, কাজটি অত সহজ ছিল না। এজন্যে বাদশাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। সব দিক থেকেই ভীষণ বাধা এসেছিল।

এখানে বড় বড় শহর ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক মফস্বল শহরে ও গ্রামে মেয়েদের স্কুল আছে। সেগুলো পাকা দোতলা- তিনতলা দালান। উঁচু উঁচু দেয়াল। স্কুলে যাতায়াতের জন্য মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা আছে। ছাত্রীদের বই, খাতা, কাগজ-পত্র যাবতীয় খরচ সরকার বহন করেন।"

"বাঃ! চমৎকার তো!"

"সউদি আরবে মেডিকেল কলেজ খোলার সময়ও অনেক বাধা আসে। বাদশাহ ফায়সাল অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। বহু তর্ক করে, বহু যুক্তি দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়। শুধু তাই নয়, ১৯৭৫ সালে রিয়াদে কেবল মাত্র মেয়েদের জন্যও একটি মেডিকেল কলেজ তৈরি করা হয়।"

শুনে রফিক অবাক হয়ে গেল।

আজ মোত্তালিব চাচা পড়াতে এলে, রফিক তাঁকে সালাম জানিয়ে নতুন শেখা আরবিতে জিজ্ঞেস করে, "আম, কায়ফা হালোক? চাচা, কেমন আছেন?"

হাসলেন চাচা, বেফাদলিল্লাহে বেখায়েব। আমি আল্লাহ্‌র ফজলে ভাল আছি। হাঁ বেটা, এমনি করে টুকরো টুকরো আরবি কথা বললে ক'দিনের মধ্যেই তা শিখে যাবে।"

রফিক এর মাঝে বেশ কয়েকটি আরবি শব্দও শিখে গেছে। যেমন ঃ উখতুন-বোন, ইব্‌নুন-পুত্র, বিনতুন-কন্যা, ফুফু-আম্মাতুন, খালা-খালাতুন, মুইয়া-পানি, রুয্-ভাত, হুত্- মাছ, লাহাম-গোশত,

www.amarboi.org

বায়েদ-ডিম, হালিব-দুধ, সুক্কার-চিনি, খুব্‌য্‌-রুটি, ফুতুর-ভোরের নাশতা, গাদা-দুপুরের খাওয়া, আশা-রাত্রের খাওয়া, গণনায় এক থেকে দশ পর্যন্তও কণ্ঠস্থ- ওয়াহেদ, এস্‌নান্‌, সালাসা, আর্‌বা, খাম্‌ছা, সিত্তা, সাব্‌আ, সামানিয়া, তিস্‌আ, আশারা।

কিছু কিছু ক্রিয়া পদও শিখে ফেলেছে। যেমন কুল্‌-খাও, কুল্‌-বল, আশ্‌রাব্‌-পান কর, তাআল্‌-এস, রুহ্‌-যাও, কেফ্‌-দাঁড়াও, এস্‌মা-শোন, ইক্বরা-পড়, উকতুব-লিখ, খাল্লে-রাখ, খুয্‌-লও, শুফ্‌-দেখ, হাতে-দাও, ইজলেছ্‌-বস, কুম্‌-ওঠ, আছবর্‌ কালিল-একটু অপেক্ষা করুন ইত্যাদি।

রফিক মোত্তালিব চাচার কাছ থেকে জেনেছে যে, কোরআনের মিষ্টি ভাষা আর এখানকার কথা আরবি ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কতকগুলো শব্দের উচ্চারণও অন্য রকম। 'কাফ্‌'কে এরা 'গাইন' যেমন কুরুছকে (মানে এক রিয়ালের বিশ ভাগের এক এক ভাগকে) উচ্চারণ করা হয় 'গুরুছ'। 'কামিছ'কে বলা হয় 'গামিছ'। 'ছে' এর উচ্চারণ অনেক সময় 'তে' করা হয়, যেমন 'ছালাছা' (তিন)কে 'তালাতা'- এরকম আরো অনেক কিছু।

পোশাক-পরিচ্ছদ যাকে আরবিতে বলা হয় লেবাস তার তিনটি শব্দ রফিককে মনে রাখতে হয় না। কেননা সেগুলো বাংলার মতোই শাড়ি (সারি), শাল (শাল) ও ব্লাউজ (আল্‌বুলুযাতু)।

দোকানকে আরবিতে দুকানই বলে। এ সাথে রফিক শিখে নিল বাজার-সুক্‌, দাম-কিমাত, রাস্তা-তারিক, ঘর-মাকাম, মালিক-ছাহেব ও কর্মচারি-খাদেম।

এদেশের কতকগুলো আদব-কায়দা রফিকের এখন পুরাপুরি রপ্ত। এখানকার লোকদের মতো সেও পরিচিত লোকজনদের সাথে দেখা হলে প্রথমে সালাম জানিয়ে হাত মিলায়। তারপর আরবিতে বলে, "আপনি কেমন আছেন? আপনার ছেলেমেয়ে, আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন সবাই কেমন আছেন? আল্লাহ্‌ আপনাদের সব সময় ভালো রাখুন–" ইত্যাদি। বন্ধু গোত্র হ'ল জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ঐ ধরনের প্রশ্ন করে।

কোন সউদির সঙ্গে সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে দেখা হলে তাকে শুভ কামনা জানিয়ে ওদের মতো বলে– "সাবা হাল্‌ খায়ের্‌'- সুপ্রভাত", বিকেল বা সন্ধ্যায় মোলাকাত হলে বলে, "মাছাআল খায়ের্‌" অর্থাৎ শুভ-সন্ধ্যা।

দাওয়াতে

সেদিন বিকেলে রফিক তবশিরদের সাথে তাদের বাসার সামনে ছোট্ট খেলার মাঠটাতে ফুটবল খেলছিল। প্রায় প্রতিদিনের মত আজও পাড়ার অন্যান্য খেলার সাথিরা এসে জুটেছে। তবশিরের ছোট ভাই তাহির, অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে ইমরান, জাকারিয়া, নাঈম, নাসিম, আবদুল আজিজ ও তার ভাই আবদুল আমীন ও আরো অনেকে।

ছুটোছুটির সময় হঠাৎ আমিন পড়ে গিয়ে নাকে চোট পায়। গল্‌গল করে রক্ত পড়তে থাকে। ছোট ভাইয়ের এ অবস্থা দেখে আজিজ কেঁদে ফেলে। খেলার সাথিরা সবাই ওর কাছে আসে। ডাক্‌তুর, ডাকতুর বলে চেঁচাতে থাকে।

www.amarboi.org

সৌভাগ্যক্রমে আলীম চাচা তখন রফিকদের বাসায় ছিলেন। রফিক বন্ধুদের সাহায্যে আমীনকে ধরে তাদের বাসায় নিয়ে এল। আলীম চাচা সাথে সাথেই আমীনের রক্তটা ধুয়ে নিয়ে, নাকটা পরীক্ষা করে ফ্রিজ থেকে বরফ আনিয়ে নাকের ওপর তা চেপে ধরলেন।

খবর পেয়ে আমীনের আব্বা-আম্মা ছুটে এসেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত পড়া বন্ধ হ'য়ে গেল।

আলীম চাচা আমীনের আব্বা শেখ ইউনুস আলীকে জানালেন 'ইস্‌আফ'– প্রাথমিক চিকিৎসা তিনি করেছেন। কাছের কোন 'ছায়দালিয়া' মানে ওষুধের দোকান থেকে যেন আলাম্- ব্যথার ওষুধ কিনে খাইয়ে দেয়া হয়। শেখ ইউনুস আলী চাচাকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন। ছেলেকে বাসায় নিয়ে যাবার সময় বার বার তাঁকে তাদের বাসায় যেতে আমন্ত্রণ জানালেন।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই তিনি আলীম চাচা-চাচি ও সেই সাথে রফিকদের সবাইকে দাওয়াত করলেন। খাবারের পর ছোটখাটো একটা ঘরোয়া কবিতা পাঠের আসরের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানালেন।

দাওয়াতের দিনে রফিক আব্বাকে বার বার মনে করিয়ে দেয়, "আব্বা, আজ আবার সন্ধ্যার পর কোথাও দেরি করো না যেন!" চাচাকেও ফোন করে, 'ডাক্‌তুর আম্, মনে থাকে যেন, আজ সন্ধ্যার পর আজিজদের বাসায় আযুমাহ্ আছে কিন্তু!"

"তায়্যেব শোক্‌রান্– আচ্ছা ধন্যবাদ" হাসলেন চাচা। "যেভাবে আরবিতে মনে করিয়ে দিচ্ছ, তা কি ভুলতে পারি? আনা কামান্ রোহ্-আমি যাব।"

যথা সময়ে ওরা আজিজদের বাসায় এল। ইউনুস চাচা ও আজিজ-আমীন এগিয়ে এসে হাসিমুখে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাদের অভ্যর্থনা জানালেন, "আহলান্, আহলান্! আসুন আসুন!"

আজিজ রফিকের আম্মা ও চাচিকে অন্দর মহলে পৌঁছে দিয়ে আসে।

তার আব্বা আলীম চাচা ও আব্বাকে হাতে হাত মিলিয়ে, আতর মেখে বসবার ঘরে নিয়ে ঢুকলেন। তাঁর স্বরে বিনয় ঝরে পড়ছে। "তাফাদ্দাল মিন্ ফাদলেক্"- অনুগ্রহ করে বসুন।

সবটা ঘর জুড়েই গালিচার ওপর ফরাশ পাতা।

অতিথিরা এক এক করে আসতে থাকেন। প্রত্যেককে আহলান্, আহলান্ বলে ঐ একইভাবে সমাদর করে ঘরে নিয়ে যান। অন্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

ভেতরে তখন টেপ্-রেকর্ডারে গান হচ্ছে। ওদের অতি প্রিয় গায়িকা উম্মে কুলসুমের গান।

পরিচয় পর্বের পর খানা পরিবেশন।

গালিচার ওপর চার ধারে প্লাষ্টিকের 'শিট্' বিছিয়ে দেয়া হ'ল।

রফিক আব্বার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল।

"মিলাদের সময় আমাদের বাসায় ফরাশের ওপর যেমন দস্তরখানা বিছিয়ে মেহমানদের খেতে দেয়া হয়, ঠিক তেমনি, তাই না আব্বু?"

আব্বা মাথা ঝুঁকিয়ে নীরবে জবাব দিলেন।

www.amarboi.org

আজ দু'জন বাড়তি লোক কাজ করছে। ওদের 'খাদেম' বলা হয়। বিরাট বিরাট ডিশে খানা সাজানো। বড় বড় গোস্তের টুকরো দিয়ে রাঁধা বিরিয়ানী। প্রচুর কিস্‌মিস্, বাদাম ও পেস্তা মেশানো। পাশে রয়েছে টম্যাটো সস্, সালাদ ও জয়তুন মানে জলপাই। মধ্যে এনে রাখা হ'ল– ও বাবা! এ যে দেখা যাচ্ছে, আস্ত একটা দুম্বা! বাদামি রং করে ভেজে বিরাট এক বাসনে সাজিয়ে রাখা হ'ল।

ইউনুস চাচার নির্দেশে একজন 'খাদেম' বিরাট রোষ্টটা কেটে কেটে অন্য একটা পাত্রে রাখতে থাকে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সবাইকে এবার খানা খেতে অনুরোধ করেন।

শুরু হয় খাওয়া। এক একটা বড় থালাতে ছ'সাত, আট-দশজন করে খাচ্ছে।

আলীম চাচা দাওয়াতে এভাবে খেয়ে অভ্যস্ত, কিন্তু রফিক বা তার আব্বা এভাবে খেয়ে অভ্যস্ত নন বলে ভালভাবে খেতেই পারলেন না। পানি খেতে গিয়েও সেই একই ব্যবস্থা। একই গ্লাসে অনেকে পানি খাচ্ছে।

আলীম চাচা ওদের বিব্রত অবস্থা দেখে হাসলেন।

"সব মুসলমান ভাই ভাই, ইসলামের এ বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আরবে উঁচু আর নিচুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, বুঝলেন? আমিরের সাথে একই কাতারে বসে তার খাদেমও খায়, একই গ্লাসে পানি পান করে। আরো জানেন ভাইসাহেব, অফিসেও এরকম। 'বসের' সামনে ছোট কর্মচারি এবং বেয়ারাগণও সমানে সমানে চেয়ারে বসে থাকে। 'বস' দেখলে উঠে দাঁড়ায় না।"

"আপনারা কিন্তু কিছু খাচ্ছেন না!"

ইউনুস চাচার আরবি কথা বাংলায় অনুবাদ করে দেন আলীম-চাচা।

"আরে সর্বনাশ! আর খেলে পেট ফেটে যাবে যে!"

এবারেও আব্বার কথা চাচা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন। ইউনুস চাচার আফসোস আর যায় না। বার বার বলেন,

"কিছুই খেলেন না আপনারা, কিছুই খেলেন না।!"

খাবারের পর প্লাষ্টিকের শিটগুলো সরিয়ে নেয়া হ'ল। পরিষ্কার ফরাশে বসল কবিতা পাঠের আসর। ইউনুস চাচা কবিতা লেখেন। কবিতার দুটো বইও বেরিয়েছে।

গোল হয়ে বসলেন সবাই।

এক একজন করে নিজের লেখা কবিতা পড়ে যেতে থাকেন। কবিদের কণ্ঠ আবেগে ভরা। তাঁরা মধুর সুরে কবিতা পাঠ করেন। অর্থ না বুঝলেও শুনতে খুব ভাল লাগে।

এ সময়ে খাদেম দু'জন ছোট চায়ের পেয়ালা 'ফিনজানে' চা পরিবেশন করে।

সবকিছু মিলিয়ে দাওয়াতের অনুষ্ঠানটি ভারি উপভোগ্য লাগছে।

যাবার সময় হ'ল।

আলীম চাচা ও আব্বা ইউনুস চাচার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন, "জাজাকাল্লাহ্! হায়াকাল্লাহ্।" আল্লাহ্ আপনার রুজি-রোজগার বাড়িয়ে দিন! আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন!"

www.amarboi.org

একে একে সবাই হাত মিলিয়ে বিদায় নিতে থাকেন। যাবার সময় বলেন, "মা আস্ সালাম!" আপনি শান্তিতে থাকুন!"

সরদ দরজা পর্যন্ত রফিকদের এগিয়ে দিতে এসে হাসিমুখে হাত নাড়লেন ইউনুস চাচা, "ফি আমানিল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে নিরাপদে রাখুন!"

মদীনার পথে

রফিকদের মদীনা মনোওয়ারায় যাবার দিন তারিখ ঠিক হ'য়ে যায়। আলীম চাচা সে ব্যবস্থা করেছেন। যাচ্ছে আলীম চাচার গাড়িতে। মদীনায় উঠবে আলীম চাচারই এক ঘনিষ্ঠ ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে। তিনি অবশ্য এখন সপরিবারে রাজধানী রিয়াদে গেছেন। সেখানে তাদের কোন আত্মীয়ের বিয়ে। চাচার বন্ধু আপসোস করে চিঠি লিখেছেন, এ সময়টায় তাঁরা নিজেরা উপস্থিত থেকে সঙ্গ দিতে পারলেন না বলে খুবই দুঃখিত। রহমান বলে বাংলাদেশের একটি ছেলে বাসার তদারকে আছে। তার কাছে ঘরের চাবি রেখে গেছেন। সব রকম নির্দেশও দেওয়া আছে।

যাত্রার আগে পারুল চাচি পথের খাবার সাথে নিলেন। "মক্কা শরীফের প্রায় তিনশ' মাইল উত্তরে মদীনা। স্বাভাবিক গতিতে গাড়ি চালিয়ে ইনশাআল্লাহ্ সাত আট ঘন্টায় পৌঁছে যাব।"

গাড়ি চালাতে শুরু করলেন আলীম চাচা। তারপর ফিরলেন রফিকের দিকে- "এবার শোন আমাদের নবীজি (সঃ) কবে, কীভাবে মদীনায় ঢুকেছিলেন।"

"জ্বী চাচা, বলুন, বলুন!"

সামনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুরু করেন আলীম চাচা,

"আমার যদ্দূর মনে পড়ে সময়টা ছিল ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে জুনের শেষ সপ্তাহ। রাসূলে করিম (সঃ) সুদীর্ঘ পথে- যে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি, পাড়ি দিয়ে কোবা নামক একটি পল্লিতে কিছুদিন থেকে তারপর মদীনার দিকে রওনা দিয়েছিলেন।"

"তখন অবশ্য এরকম সুন্দর পথ ছিল না। গাড়িও ছিলো না দূরের যাত্রীরা উটের পিঠে চড়ে পাহাড়ি পথে যাতায়াত করত। কোবা তো পথেই পড়বে!" কথার মধ্যে বললেন পারুল চাচি।

"হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যাবার সময় কোবায় থামব না। কাছেই তো মদীনা! সেখানে পৌঁছে-পর আস্তে-ধীরে কোবাতে বেড়াতে আসা যাবে'খন। হ্যাঁ কী বলছিলাম, কোবা থেকে দুপুরের দিকে হযরত (সঃ) একটি উটের পিঠে চড়ে যাত্রা করলেন। আগে থেকেই মদীনাবাসীরা তাঁকে বরণ করে নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। শহরের কাছাকাছি যেতেই তাদের মধ্যে ভীষণ একটা সাড়া পড়ে গেল। উট ধীরে ধীরে নগরে ঢুকল। অভ্যর্থনাকারীরা আল্লাহু আকবর বলে, নগর কাঁপিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে। তাদের সাথে তোমার মত ছোট ছোট ছেলেমেয়েও ছিল। সবাই হযরত (সঃ)কে দাওয়াত দিচ্ছেন, "হে রাসূলুল্লাহ্, দয়া করে আমার ঘরে আসুন!"

রাসূলুল্লাহ্ কার দাওয়াত কবুল করবেন? একজনকে সন্তুষ্ট করতে গেলে, অন্যজন অসন্তুষ্ট হয়। ভেবে-চিন্তে শেষে তিনি উটের লাগাম ছেড়ে দিলেন। বললেন, "আল্লাহ্র ইচ্ছায় উটটি যার বাড়ির

www.amarboi.org

সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, আমি তার বাড়িতেই উঠব।"

উটটি চলতে চলতে একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির মালিকের নাম আবু আইয়ুব আনসারী। তিনি খুশিতে আত্মহারা হলেন। ছুটে গিয়ে নবীজিকে বাড়ি নিয়ে এলেন। মহানবীর এ শহরে আসার পর থেকে এর নামকরণ করা হয় মদীনাতুন্নবী- নবীর শহর, সংক্ষেপে মদীনা। আগে জান বোধ হয়, মদীনার নাম ছিলো ইয়াস্‌রব। নবীজি এখানেই তাঁর শেষ দিনগুলো কাটিয়ে ছিলেন। মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য আর ফিরে যাননি। মদীনাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এবং এখানেই রয়েছে তাঁর সমাধি।

কয়েকটা নীরব মুহূর্ত পেরিয়ে যায়। গাড়ি ছুটে চলেছে। এখানেও মসৃণ, সুন্দর রাস্তা। একটুও ঝাঁকুনি নেই। দু'পাশে আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি। অনেক বাড়ির সামনে, পেছনে বা আশেপাশে সবুজ গাছপালা। রাস্তার দু'ধারেও গাছের সারি।

"জেদ্দার মতো এখানেও গাছপালা বহু যত্নে কষ্টে ও খরচ করে লাগানো।" রফিক খেয়াল করল, পথের দু'পাশে নিমগাছই বেশি। "এর কারণ কী চাচা?"

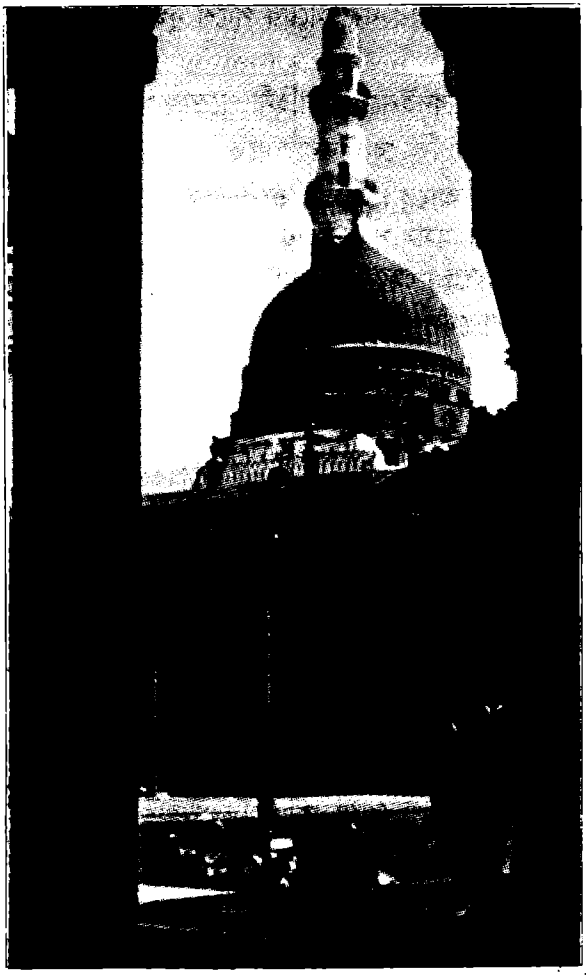

মদীনায় মসজিদে নববীর সবুজ গম্বুজ

"আমি তো বেটা ডাক্তার, গাছের অত কিছু বুঝি না, তবে মনে হয় এদেশের আবহাওয়ায় ও মাটিতে নিমগাছ সহজে জন্মে ও অল্প যত্নেই বেঁচে যায়।"

গাড়ির চাকা গড়িয়ে গড়িয়ে পেরিয়ে এল তিন-চার মাইল। শুরু হল আরবের আসল রূপ।

পথের দু'পাশে কোথাও পাথরের পাহাড়, কোথাও বা অনেকটা জায়গা জুড়ে বালুভরা মরুভূমি। মরুভূমিতে ছোট ছোট কাঁটার ঝোপ। "এই কাঁটার ঝোপগুলো উটের খুব প্রিয় খাবার।" শুনে অবাক হ'ল রফিক। মাঝে মাঝে বাস-স্টপেজ। দূর থেকে কখনো বা নজরে পড়ে ঘর-বাড়ি- কোথাও মাটির কোথাও বা তাঁবুর। ওগুলো অস্থায়ী বেদুইন পল্লি।

www.amarboi.org

"দেখ, তাঁবুর ঘর, ঘরের পাশে দুম্বা বক্‌রা-বক্‌রি ও উট রাখার জন্য খাঁচার ঘর। কাছেই রয়েছে পিক্‌আপ।"

রফিক বেদুইনদের কাহিনী পড়েছে। ওরা দুর্ধর্ষ নিষ্ঠুর যাযাবর।

"এখনো কি বেদুইনরা আছে চাচা?"

"হ্যাঁ, আছে। কম। তবে এখন ওরা আগের মতো আর দুর্ধর্ষ নয়। সউদি সরকার এদের স্থায়ীভাবে বসবাস করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। ওদের জন্য মরুভূমিতে জেনারেটারেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ছেলেমেয়েদেরও কাছাকাছি পল্লি অঞ্চলের স্কুলে যেতে উৎসাহিত করা হয়।"

দেখা গেল মুখখোলা বোরকা পরা কয়েকজন কিশোরী দুম্বা তাড়িয়ে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। গায়ের রং শ্যামলা। চেহারাও আসল সউদি মেয়েদের মতো সুন্দর নয়।

"ছেলেদের তুলনায় বেদুইন মেয়েদের খাটতে হয় অনেক বেশি।" আলীম চাচার কথার মাঝে হঠাৎ হাততালি দিয়ে ওঠে রফিক।

"আরে দেখ, দেখ! কত্‌তো খেজুর গাছ! আর গাছের পাতাগুলো কী সুন্দর! বড় ও ছড়ানো, তাই না আম্মু?"

হঠাৎ একরাশ শ্যামল স্নিগ্ধতা নিয়ে খেজুর বনের আবির্ভাব। ঘন-বিস্তীর্ণ বন। অনেকটা জায়গা জুড়ে সবুজের মেলা! কী সুন্দর তার শোভা! মরুদ্যান।

মরুদ্যান পেছনে পড়ে থাকে। গাড়ি দ্রুত বেগে ছুটছে। ফের ধূ ধূ করা মরুভূমি। নির্জন। জনমানব শূন্য।

বেশ কিছুক্ষণ পর আলীম চাচা গাড়ি থামালেন। ছোট একটা শহর। ছিমছাম। পরিচ্ছন্ন। রাবাক শহর। পেট্রোল নেয়া দরকার। তাছাড়া পিপাসাও পেয়েছে। কোকাকোলা, পেপ্‌সি, ম্যাঙ্গো জুস্- কোন কিছু একটা খেতে হবে।

সামনে একটা রেস্তোরাঁ। পাকা দালান। পরিষ্কার। টেবিল-চেয়ারও ঝক্‌ঝকে!

সাথে তাদের খাবার রয়েছে। দোকান থেকে শুধু বড় বড় শাঁসালো মিঠে খেজুর কিনে নেয়া হ'ল।

সবাই এক বোতল করে কোকাকোলা ও পেপ্‌সি কোলা কিনে খেল।

শুরু হ'ল আবার মরুভূমির পথে যাত্রা।

বদর প্রান্তরে

বিকালের আগেই রফিকরা ইতিহাসখ্যাত বদর প্রান্তরে পৌঁছে গেল। বদর স্থানটি মদীনার সীমানার একটি গিরি প্রান্তর। মক্কা থেকে মদীনা কিংবা সিরিয়ায় যাওয়া আসা করতে হলে এই গিরিপথ দিয়েই যেতে হ'ত। আব্বা বদরের যুদ্ধের ইতিহাস সংক্ষেপে বয়ান করেন।

"হিযরতের পর হযরত মুহম্মদ (সঃ) এই বদরের মাঠেই মাত্র তিনশত তেরজন সাহাবী নিয়ে বিধর্মী কোরাইশদের বিরাট এক সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলা করেছিলেন। আবু জেহেল বলে একজন

www.amarboi.org

ভয়ানক খারাপ লোক ছিল বিধর্মীদের নেতা। সে যখন তার বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছিল, রাসূলে করিম (সঃ) তখন সঙ্গীদের অভয় দিচ্ছিলেন,

"তোমরা ভয় পেও না। আমাদের সাথে পরম আল্লাহ্তায়ালার মঙ্গল কামনা রয়েছে।"

বদরের যুদ্ধের দিনকে আল্লাহ্তায়ালা ইয়াওমাল ফোরকান বা সত্য-অসত্যের পার্থক্য প্রকাশক দিন বলে ঘোষণা করেছেন।

যুদ্ধে মুসলমানদের খাবার ফুরিয়ে গেছে। পানির ভীষণ অভাব!

শত্রুরা পানির সবগুলো জায়গা ঘিরে রেখেছে। কিন্তু আল্লাহ্র কী বিচিত্র মহিমা! হঠাৎ ঝুমঝুম করে বৃষ্টি নামে। তৃপ্তির সাথে পানি পান করে মুসলমান সৈন্যরা দেহ ও মনে বলীয়ান হয়ে ওঠেন। মুসলমানদের পক্ষে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত হামযা (রাঃ) যথাক্রমে কাফেরদের শক্তিশালী দুইজন সেনাপতি অলীদ ও ওৎবাকে নিহত করেন। এতে কাফেরগণ দ্বিগুণ তেজে অগ্রসর হ'তে থাকে। নবীজি এ সময়ে একমনে আল্লাহ্র ধ্যানে বসলেন, "হে আল্লাহ্! মুসলমানদের এই ছোট্ট দলটি যদি আজ শেষ হ'য়ে যায়, তবে তোমার পবিত্র নাম নেবার যে কেউ থাকবে না!" আশ্চর্য মুসলমানেরা জিতে গেলেন। তাদের মাত্র চৌদ্দজন শহীদ হন। কাফেরদের সত্তর জন ওদের হাতে বন্দি হল। এর আগে আরবদেশের প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধবন্দিদের মেরে ফেলা হ'ত। নবীজি এ প্রথা তুলে দেন। বন্দিদের না মেরে, বরঞ্চ তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে নির্দেশ দেন। এই বদরের যুদ্ধের পর মদীনায় মুসলিম শাসন স্বীকৃত হয়। মহানবীর (সঃ) মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ) আগেই সমস্ত আরব উপদ্বীপ ইসলামের শাসনাধীনে চলে আসে।"

কথা প্রসঙ্গে আলীম চাচা সউদি আরবের রাজত্বের কথা বলেন।

আধুনিক সউদি রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা হ'লেন আব্দুল আজিজ ইবনে সউদ। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। তিনি যখন তেত্রিশ বছরের তরুণ, তখন তুর্কীদের হারিয়ে দিয়ে তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হাসা দখল করেন। ১৯২৫ সনে হেজাজ ও তার পরের বছর আছির প্রদেশের অধিকাংশ জায়গাও তাঁর দখলে আসে। ১৯৩২ সনে তাঁর অধিকৃত অঞ্চলটি যেমন রিয়াদ, হেজাজ, নজদ ও আছির অঞ্চল নিয়ে সউদি রাজত্ব গঠিত হয়। এরপর যথাক্রমে সউদ ইব্নে আবদুল আজিজ, বাদশাহ্ ফায়সাল, বাদশা খালেদ ও বাদশা ফাহ্দ সিংহাসনে বসেন।"

"সউদি আরবের রূপটা আসলে বদলে গেছে কিন্তু বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে।"

আব্বার অসম্পূর্ণ এ তথ্যের পিঠে প্রশ্ন রাখেন আম্মা, "কী রকম?"

"এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক তেল কোম্পানি এখানে প্রথম তেল আবিষ্কার করেন। ফলে সউদি আরবে একটা নতুন যুগ আরম্ভ হয়।"

"আর জানেন তো ভাবি", বলেন পারুল চাচি, "সউদি আরবে কোন শাসনতন্ত্র বা পার্লামেন্ট নেই। রাজা ও রাজপরিবারের সদস্যরাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী!"

www.amarboi.org

"তা জানি" বলেন আম্মা, "আর এও জানি প্রায় সাতশ' জন রাজপুত্র সবাই সরকারি সুবিধা ভোগ করছেন। প্রচুর অর্থের অধিকারী চল্লিশজন রাজপুত্রের নিজেদের দলই বড় বড় সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতামত দেন।"

"ইসলাম ধর্মের আইন ও কুরআন ও সুন্না অনুযায়ী দেশ শাসিত হয়। দেশে মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ও সুদ নেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।"

আব্বা-আম্মা, চাচা ও চাচির আলাপ-আলোচনা থেকে রফিক সউদি আরবের রাজা ও রাজত্বের কথা জেনে নিল।

কথা বলতে বলতে ওরা অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

আলীম চাচা একটি নির্জন জায়গায় এসে গাড়িটা এক পাশে রাখলেন। কয়েকটা নিম গাছের নিচে চাদর বিছিয়ে সবাই খাবারের জন্য বসে। ভুনি খিচুড়ি ও গোশত এনেছেন চাচি।

আম্মা ও চাচি পরিবেশনের পর নিজেদের থালাতেও খাবার বেড়ে নিলেন।

দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সবাই খুব ক্ষুধার্ত। খুব তৃপ্তির সাথে খাবার খেয়ে রওয়ানা দিল সবাই।

মদীনা মনোওয়ারায় মসজিদে নববীতে

ওরা মদীনায় পৌঁছে যায়। এখানে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বিখ্যাত যে মসজিদটি তৈরি করেছিলেন তার নাম মসজিদে নববী। মসজিদে নববীর উঁচু মিনারগুলো যেন তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আলীম চাচা বন্ধুর বাড়িতে না গিয়ে এখানেই প্রথম এসে গাড়ি থামালেন। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আযানের সুমধুর সুর ভেসে আসছে। রফিক অবাক হ'য়ে লক্ষ্য করে, এ মসজিদের দু'দিকের দু'টি মিনার থেকে দু'জন মুয়ায্যিন একই সাথে আযান দিচ্ছেন। এখানে সবাই ওযু করে নামায পড়ে নিলেন। মসজিদের বিরাট ইমারত দেখে তারা মুগ্ধ! বর্তমান মসজিদটি রাসূলে করিমের মূল মসজিদের চারদিকে অনেকটা এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে। চাচা বললেন, "এর লাল রঙের অংশটি তৈরি হয়েছে তুর্কী আমলে, আর সামনের দিকের মার্বেল পাথরের তৈরি ইমারতটি সউদি আমলের। মসজিদের গায়ে অপূর্ব সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্য। ওপরের নানান রকমের মূল্যবান ঝাড়। মেঝেতে বিছানো দামী কার্পেট।

রফিকরা ঘুরে ঘুরে মসজিদটি দেখছে। প্রথমে এসে দাঁড়ালো হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর রওজা শরীফের পাশে। এটি মসজিদের ভেতরেই। নবীজির জীবিত কালে এটি তাঁর সহধর্মিণী বিবি আয়েশা (রাঃ) এর ঘর ছিল। এ ঘরেই নবীজিকে দাফন করা হ'য়েছিল। হযরতের রওজা মুবারকের পাশেই দুই খলিফা- হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর করব। রওজা শরীফ তিনটিই খুব সুন্দর! ঝকমক্ করছে। কাছে দাঁড়িয়ে তাঁরা নবীজি ও দুই খলিফার খেদমতে দরূদ ও সালাম পেশ করলেন।

www.amarboi.org

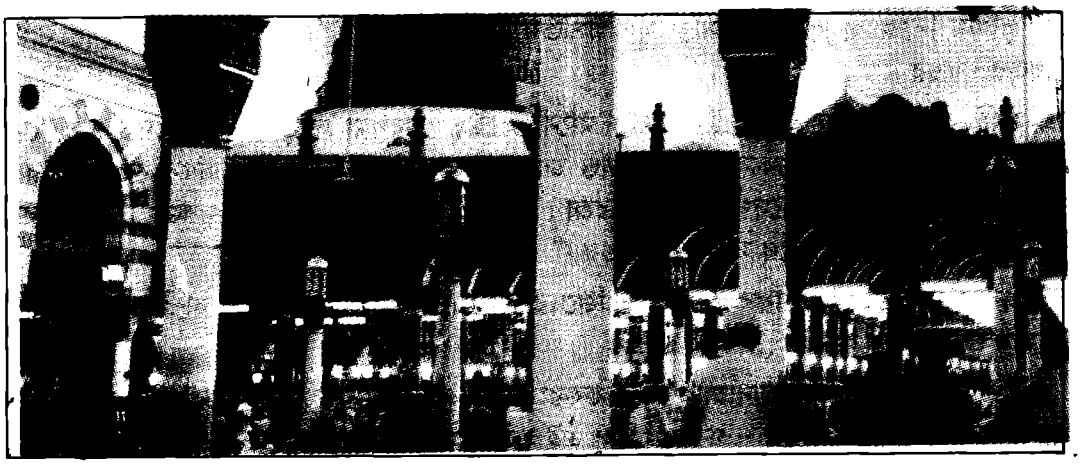

মদীনার মসজিদে নববীতে মহানবী (সঃ)-এর রওজা মোবারকের সামনের ভাগ

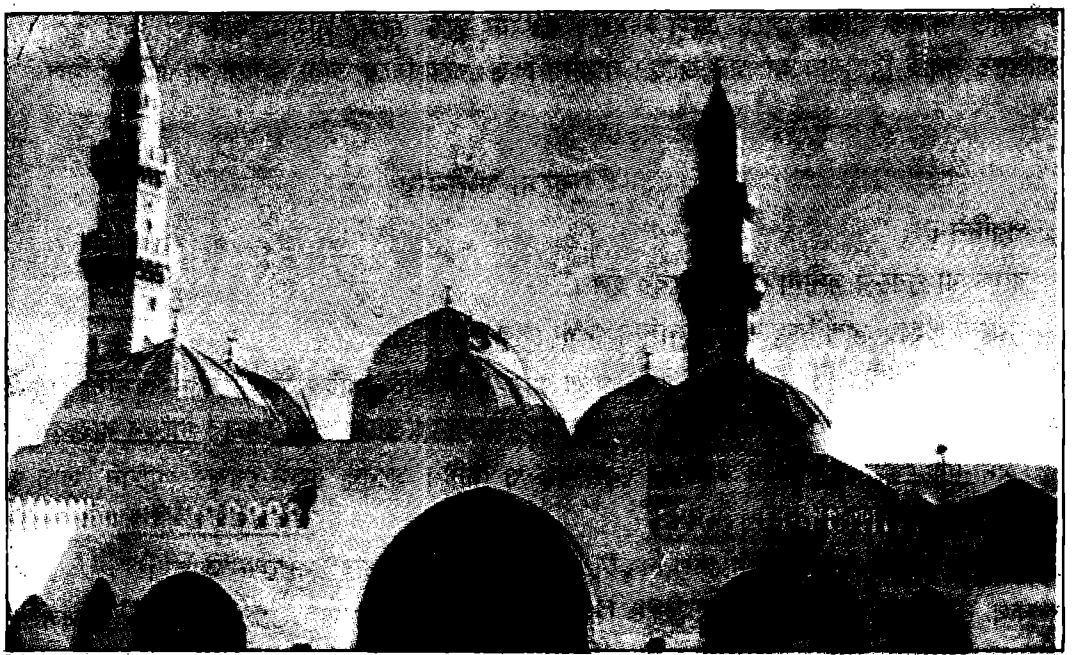

ইসলামের ইতিহাসে প্রথম নির্মিত মসজিদে কুবা। যা হযরত মোহাম্মদ (সঃ) স্বশরীরে নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে সংস্কারের পর বর্তমান নবনির্মিত মসজিদে কুবার দৃশ্য।

www.amarboi.org

পশ্চিম দিকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) মূল মসজিদ। বহু আগে এটি কাঁচা ঘর ছিল। ঘরের থাম ছিল খেজুর গাছের।

চাচি রফিককে সুন্দর একটি মিহ্‌রাব মানে যে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়া হয়, দেখিয়ে বললেন, "এই মিহ্‌রাব থেকে রওজা পর্যন্ত জায়গাটিকে 'রিয়াজুল্ জান্নাত' মানে বেহেশতের অংশ বলা হয়। আর ওদিকে দেখ, একটা দরজা। নাম 'বাবে জিবরাঈল'। এ দরজা দিয়ে জিবরাঈল (আঃ) নূরনবীর (সঃ) সাথে সাক্ষাৎ করতেন।"

একটা জরুরি কথা রফিক জানল, হাজিদের এই মসজিদে হজ্বের আগে বা পরে চল্লিশ রাকাত নামায পড়তে হয়।

এখানে এশার নামায আদায় ক'রে রফিকরা চাচার বন্ধুর বাসার দিকে রওয়ানা দেয়। পথে চাচি রফিককে বললেন, জান বেশি গরম পড়লে এই মসজিদে তোমার মতো ছোট ছোট ছেলেরা সোরাহী ভরে পানি নিয়ে আসে। ছোট বাটিতে ক'রে নামাযিদের পানি পান করায়। বিনা পয়সাতেই ওরা কাজ করে। তবে কেউ খুশি হ'য়ে দু'এক রিয়াল দিলে ওরা তা খুশি হ'য়েই নেয়।"

গাড়ি থেকে বাইরে দৃষ্টি ফেরায় রফিক। বিজলি বাতির আলোয় মদীনার পথ স্পষ্ট দেখা যায়। এখানেও খুব সুন্দর প্রশস্ত পাকা রাস্তা। নতুন তৈরি বিরাট বিরাট দালান-কোঠা।

গাড়ি নির্দিষ্ট বাড়ির গেটে এসে থামল। রহমান ছুটে এসে, সালাম জানিয়ে গেট খুলে দিল। ক্লান্তিতে সবাই বিছানার আশ্রয় খুঁজছে। সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে তারা শয্যায় গা এলিয়ে দিল।

পুরনো মদীনায়

পরদিন।

রফিকরা পুরনো মদীনা দেখতে বের হল।

পুরনো শহরে বেশ কিছু মাটির দালান দেখা গেল।

"এ দেশে বৃষ্টি খুব কম বলে মাটি গলে যায় না। তাই মাটির ঘরে কোন অসুবিধে নেই।" কয়েকটা মাটির ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন আলীম চাচা। স্থানে স্থানে খেজুর গাছের বাহার।

"মদীনার খেজুর দেখবেন আকারে বেশ বড় ও মিষ্টি। অনেক রকম খেজুর পাবেন, তার মধ্যে কলেমা খেজুর সবচেয়ে ভাল।"

"মদীনা থেকে ফেরার সময় বেশ কিছুটা খেজুর কিনে নিয়ে যাব" বললেন আম্মা।

কথা বলতে বলতে ওরা মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে চলে আসে। ওহোদ পাহাড়। কেবল পাথর আর পাথরের স্তূপ। লতা-পাতা, গাছপালা কিছুই নেই। সেখানে দাঁড়িয়ে আলীম চাচা বললেন, "এই পাহাড়ে কোরাইশদের সঙ্গে নবীজির ভীষণ লড়াই হ'য়েছিল। প্রথম দিকে মুসলমানরা জয় লাভ করেছিল। কিন্তু তাদের একটা ভুল হ'য়ে গিয়েছিল। রাসূলে করিম (সঃ) সৈন্যদের একটি সুড়ঙ্গ পথ

www.amarboi.org

পাহারা দিতে বলেছিলেন। জয়ের আনন্দে তারা সব ভুলে যায়। সেখান থেকে সরে আসতেই কোরাইশরা হঠাৎ আক্রমণ করে বসে। ফলে সত্তর জন মুসলমান শহীদ হন। রাসূলে করিম (সঃ) নিজেও গুরুতররূপে আহত হন। নানান রকম ঝড়-ঝাপটা ও ঈমানের পরীক্ষার পর মুসলমানেরা পরে অবশ্য জয়ী হ'য়েছিলেন।"

সেখান থেকে তারা বিরাট একটি গোরস্থানের কাছে এল। চারদিকে দেয়ালের ঘের। আলাদা করে কোন কবরই বাঁধানো নেই। হযরত হামযা (রাঃ), অন্যান্য সত্তরজন বিশিষ্ট শহীদান এবং ইসলামের প্রথম মুবাল্লিগ মানে ধর্ম প্রচারক হযরত মুসায়েব বিন্ উমায়েরের কবর এখানেই।

রফিক বড়দের সাথে কবর যিয়ারত করে।

এবার সবাই এলেন সেখানে, যেখানে খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ হ'য়েছিল। আলীম চাচা ইতিহাসের পাতায় ফিরে গেলেন।

"কাফেরদের দল শক্তিশালী হ'য়ে উঠছে। এদের হাত থেকে মদীনাকে কিভাবে রক্ষা করা যায় এ নিয়ে নবীজি (সাঃ) চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। এ সময়ে নবীজির একজন প্রবীণ সাহাবা-পারশ্য দেশীয় সালমান ফারেসী তাঁর একটি পরিকল্পনার কথা বলেন। নগরের চারদিকে পরিখা বা খাত খনন করে শত্রুর আক্রমণ থেকে তা অনেকটা দূরে রাখা যায়। যুদ্ধে রক্ষা পাবার জন্য নতুন ধরনের এরূপ কৌশলের কথা আরবাসীরা আগে কখনো শোনেনি। নবীজি (সাঃ) তাই উৎসাহের সাথে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। মদীনার অরক্ষিত স্থানগুলো ঘিরে পরিখা খননের কাজ শুরু হ'য়ে যায়। প্রায় তিন হাজার মুসলিম সেনার সাথে নবীজি (সঃ) নিজেও কোদাল ঝুড়ি নিয়ে কাজে নামেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই পাঁচগজ চওড়া, পাঁচগজ গভীর ও ছ' হাজার হাত লম্বা এই পরিখাটি খনন করে ফেলেন। কোরাইশরা প্রচন্ড শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে, কিন্তু কিছুতেই খাত পার হতে পারছিল না। তার ওপর ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টিপাতে তারা ভয়ানক নাজেহাল হ'তে থাকে। উপায় না দেখে কোরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান দলবল নিয়ে মদীনা ছেড়ে চলে যায়।

যেখানে পরিখা ছিল, এখন সেখানে দিব্যি সুন্দর রাস্তা।

কাছেই বেশ একটু উঁচু জমিতে রয়েছে 'মসজিদুল ফতেহ্' বা বিজয়ের মসজিদ। "বিজয়ের মসজিদ- তার মানে এখানে যে যুদ্ধ হ'য়েছিল তাতে মুসলমানরা জিতেছিল, তাই না চাচা?" রফিকের প্রশ্নে বলেন চাচা, "ঠিক ধরেছ বেটা! একবার কোরাইশ ও ইহুদিরা একজোট হ'য়ে, বেশ শক্তিশালী এক বাহিনী গড়ে তুলে, ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে দেবার জন্য লড়াই ঘোষণা করে। নবীজি (সঃ) জয়লাভের জন্য দু'হাত তুলে আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করেছিলেন। মুসলমানরা জিতে গেল। যে জায়গায় দাঁড়িয়ে নবীজি দু'আ চেয়েছিলেন, পরে সেখানে তিনি এই বিজয় মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।"

অদূরে ছোট ছোট আরো কয়েকটি মসজিদ। সাগরে দ্বীপপুঞ্জের মতো।

হযরত আলী (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ), বিবি আয়েশা (রাঃ), সালমান

www.amarboi.org

ফারেসী ও আরো কয়েকজনের স্মৃতি বহনকারী এসব মসজিদ।

সন্নিকটে মসজিদে কিবলাতাইন।

"এ মসজিদটি কেন তৈরি করা হ'য়েছিল, বলুন চাচা।"

"বলছি। এ মসজিদ তৈরির ঘটনার পেছনের কাহিনী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শোন! হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন মক্কায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন, তখন তিনি কাবাঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তেন। কাবাঘর তখন নানান ধরনের মূর্তিতে বোঝাই ছিল। এতে কাফেররা ঠাট্টা করে বলত- হযরত, তুমি আমাদের দেব দেবীর নিন্দা কর। অথচ এখন দেখছি তুমি তাদের প্রতিই সেজদা করছ! তখন নবীজি (সঃ) বাধ্য হ'য়ে জেরুজালেমে হযরত সুলায়মান পয়গম্বর নির্মিত মসজিদ বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়তে থাকেন। এতে নামাযের সময় কাবাঘর পেছনে পড়ে। তাতে তিনি মনে শান্তি পেতেন না। মসজিদে বসে আল্লাহ্‌র ওহী পাবার জন্য তিনি ওপরের দিকে তাকাতেন। একদিন এখানে সাহাবীদের নিয়ে জামাতের নামায পড়ছিলেন, এমন সময় ওহী নাযিল হ'ল, "কাবার দিকে মুখ ফেরাও!" সঙ্গে সঙ্গে কাবাঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁরা বাকি ফরয নামায শেষ করলেন। সেদিন থেকেই কেবলামুখী হ'য়ে নামায পড়ার নিয়ম চালু হ'ল। মদীনার কাছাকাছি এই মসজিদটিতে জেরুজালেম ও মক্কা দু'দিকেরই নামাযের স্থান করা হয়েছে। সে জন্য এটি মসজিদ-ই-কিবলাতাইন বা দুই কেবলার মসজিদ নামে পরিচিত।

মসজিদগুলোর কাছে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী খোলা দোকান বসেছে। ফল, শুকনো মিষ্টি, বিস্কুট, খেজুর, খুর্মা, ফলের ক্যান, সেভেন-আপ্ জাতীয় পানীয়, আতর, সুর্মা, চুড়ি, নকল গহনা, পুঁতি বসানো ব্যাগ, খেলনা, জায়নামায, তসবীহ্ এ ধরনের জিনিসপত্রে দোকানিরা জায়গাটাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। বোরকাপরা মহিলা বিক্রেতার সংখ্যাই অধিক। তাঁরা অবশ্য খাস্ সউদি আরবের মহিলা নন।

আম্মা ও পারুল চাচি কিছু কেনাকাটা করে গাড়িতে উঠলেন।

সেখান থেকে তারা এসে নামল একটি 'বির্' বা কূয়োর ধারে। পরবর্তীকালে মদীনাবাসীদের পানির অভাব দূর করবার জন্য তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রাঃ) এই কূয়ো কিনে নিয়েছিলেন।

রফিক নিচের দিকে ঝুঁকে দেখল। কূয়োটা গভীর, কিন্তু একদম শুকনো।

এবার কোবা পল্লির পথে। দু'দিকে পুরনো ঢঙের কয়েকটা খুব উঁচু বাড়ি- অনেকটা দুর্গের মতো।

অল্প সময়ের মধ্যেই তারা কোবা পল্লিতে পৌঁছে যান।

"আগেই বলেছিলাম না", বললেন আলীম চাচা, "হিযরতের সময় হযরত (সঃ) মদীনায় ঢুকবার আগে এই কোবা পল্লিতে চৌদ্দদিন ছিলেন। সাথে ছিলেন হযরত আবুবকর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাগণ। নামাযের জন্য তিনি এখানে একটি মসজিদ তৈরি করেন। নাম মসজিদে কোবা।"

গাড়ি তখন মসজিদে কোবার সামনে থেমেছে। চাচি বললেন, "এর বিশেষত্ব হ'ল মুক্ত ইসলামের এটিই প্রথম মসজিদ। জান, এই মসজিদ তৈরি করবার সময় হযরত (সঃ) নিজ হাতে ইট পাথর

www.amarboi.org

বহন করেছিলেন। কোবাবাসীদের অনুরোধে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) প্রতি শনিবারে এই মসজিদে জোহরে নামায পড়তেন। এখনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা শনিবারে এখানে জোহরের নামায পড়তে ভিড় করেন।"

ওরা সবাই ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদে নামায পড়ে নেন।

আজ এখান থেকে রফিকরা বাড়ি ফিরে আসে।

জান্নাতুল বাকি

পরদিনই রফিকরা মদীনার বহু পুরনো গোরস্থান জান্নাতুল বাকিতে এল। কবর যিয়ারত করবে। মসজিদে নববীর খুব কাছে গোরস্থানটির চারদিক খুব উঁচু দেয়ালে ঘেরা। ফটকের বাইরে মহিলাদের ভিড়। আম্মা ও চাচি এসে এখানে দাঁড়ালেন। এখান থেকেই দু'আ দরূদ পড়বেন এঁরা। রফিক আব্বা চাচা ও একজন গাইডের সাথে ভেতরে ঢুকে দেখল সেই মক্কার 'জান্নাতুল মা'আলার মতো এখানকার কবরগুলোও অতি সাধারণ।

কণ্ঠস্বর খুব নিচে নেমে গেল আলীম চাচার।

"আগে বিশিষ্ট কবরগুলোর ওপর বাঁধানো স্মৃতি চিহ্ন ছিল। সউদি শাসন শুরু হলে পর, সব কবরের পাকা ইমারত ভেঙে ফেলা হ'য়েছে। এখানকার গাইড বা কোন মোয়াল্লেমের কর্মচারী মুখে মুখে বলে দেখিয়ে দেন যে এটা অমুকের কবর, ওটা তমুকের কবর। তাদের কথা ভুলও হ'তে পারে, আবার শুদ্ধও হ'তে পারে। দেখছেন, এ গোরস্থানে তুলনামূলকভাবে জায়গা খুব কম।"

ভেতরে ঢুকেই প্রথমে রফিকের ছোট্ট একটি কবরের নিশানার দিকে নজর পড়ে। "এ ছোট্ট কবরটা কার?"

"রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)র প্রিয় ছেলে সাহেবজাদা ইবরাহীমের।"

গাইড একের পর এক পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, "দেখুন, এর নিকটেই রয়েছে হযরত আলী (রাঃ) এর ভাই আকীল বিন্ আবিতালিবের কবর। হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ অন্যান্য উম্মুল মুমেনীনদের কবরও রয়েছে পাশাপাশি। সাথেই নবী করিমের কন্যা উম্মে কুলছুম ও জয়নাবের (রাঃ) সমাধি।"

তাঁরা ধীর পায়ে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গেলেন।

"এই কবরটি হ'ল হযরত আব্বাসের (রাঃ)। কাছেরটি হ'ল নবী-কন্যা বিবি ফাতেমার (রাঃ)। ওই যে একসারিতে যে কবরগুলো দেখছেন, ওগুলো হ'ল ইমাম হাসান, ইমাম জয়নুল আবেদীন, ইমাম বাকের ও ইমাম জাফর সাদেকের (রাঃ)। ওই কোণের দিকে দেখুন! পর পর কয়েকটি কবর। ওগুলো হযরত (সঃ) এর ফুফুদের। অন্যদিকেরটি হ'ল তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের (রাঃ)।" গাইড হযরত (রাঃ) এর দুধ মা হালিমার কবরটির প্রতিও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

কবর যিয়ারত করে দু'আ দরূদ পড়ে, সবার সাথে রফিক যখন বাইরে এল, মদীনার সূর্য তখন মাথার ওপরে।

www.amarboi.org

আলোরেখা

মদীনার দিনগুলো যেন স্বপ্নের ঘোরে কেটে যায়।

রফিকদের ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

এই মদীনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র বন্ধু হাবিবুল্লাহ (সঃ)! তাঁর পবিত্র পায়ের ধুলায় ধন্য হ'য়েছিল শহর। সেই শহরটিতে থাকছে, ঘুরে ফিরে দেখছে রফিক! আল্লাহ্‌তায়ালা তাকে সে সুযোগ দিয়েছেন। তার প্রতি তাঁর কত রহম! সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভক্তিতে রফিকের মাথাটা আপনিই নুয়ে পড়ে।

ফেরবার দিন সবার সাথে সে আবার রাসূলুল্লাহর (সঃ) কবর জিয়ারত করতে যায়। গিয়ে দেখে গতকাল আম্মা যে জায়নামাজটা ভুলে এখানে ফেলে গিয়েছিলেন, দ্বাররক্ষী সেটা তুলে ঝুলিয়ে রেখেছেন। এমন জায়গায় ঝুলিয়েছেন যে, এদিক দিয়ে যে-ই ভেতরে ঢুকবে, তার নজরে তা পড়বেই! আম্মা দরজার প্রহরীর কাছে গিয়ে জায়নামাজটি দেখিয়ে বললেন, "হাযা লি- এটি আমার।"

বাস, প্রমাণের প্রশ্ন উঠে না। সাথে সাথেই তিনি সেটা দিয়ে দিলেন।

মক্কার মতো এখানেও একটা ভিখারিও নেই। চোর ছ্যাঁচড় নেই। লোককে ঠকাবার চেষ্টা নেই।

আযান পড়ার সাথে সাথে এখানেও দোকানিরা দোকান খোলা রেখে নামায পড়তে চলে যান। কী চমৎকার!

রফিক ও অন্যান্য সবাই এবার এহ্‌রাম বেঁধে নিল। রওয়ানা দিল মক্কা অভিমুখে।

দীর্ঘ পথ। আলীম চাচার 'কার' ছুটে চলেছে। তার চেয়েও দ্রুত বেগে ছুটছে রফিকের মন। ..... ওহ্! কী ভাল এদেশের লোকেরা! ডাকাতির ভয় নেই, চুরির প্রশ্ন নেই, জোচ্চুরি, ঠগবাজি কোন কিছুই নেই! খাস মদীনাবাসীদের ব্যবহার কী অমায়িক!... লেখাপড়াতেও ওরা আজকাল এগিয়ে যাচ্ছে। রফিক শুনেছে শিক্ষা খাত ও দেশের উন্নতির কাজের জন্য সউদি কর্তৃপক্ষ প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) দেশের লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি লাভ করবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে ডিঙিয়ে অনেক ওপরে উঠে যাবে ..... মিষ্টি এ ভাবনাটির মাঝে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রফিক বিভোর হ'য়ে রইল।

www.amarboi.org